# ভোরের মালতী

সুবোধ ঘোষ

ক্লাসিক প্রেস

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন, ১৩৬৪
দ্বিতীয় মুদ্রণ
বৈশাখ, ১৩৬৫
তৃতীয় মুদ্রণ
বৈশাখ, ১৩৬৭
চতুর্থ মুদ্রণ
বৈশাখ, ১৩৬৮

প্রকাশক
নারায়ণ সেনগুপ্ত,
৩/১এ, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

প্রচ্ছদ রূপায়ণ
গণেশ বসু

মুদ্রাকর
শ্রীইন্দ্রজিৎ পোদ্দার,
শ্রীগোপাল প্রেস,
১২১ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৪

## লেখকের অন্যান্য রচনা

ভারত প্রেমকথা

ত্রিযামা

সুজাতা

কুসুমেষু

ফসিল

কিংবদন্তীর দেশে

থির বিজুরী

শুন বরনারী

মীন পিয়াসী

## গল্প সূচী

ভোরের মালতী, নন্দের নন্দন, শান্তিদাতা, সম্পত্তি, গানের চেয়ে বেশী, দেবতারে প্রিয় করি, স্বমহিমচ্ছায়া, মিথ্যা মা, নমিতার সেতার, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, পরিপূর্ণা !

সারা বাড়ির ব্যস্ততা আর চঞ্চলতার রকম দেখলে মনে হবে, যেন স্বপ্নে পাওয়া একটা ঘটনার পরিণাম এখনি স্বচক্ষে দেখে নিয়ে এখনি শাঁখ বাজাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে এই বাড়ির মন। কাজগুলি যেন দৌড়াদৌড়ি করছে, যেন তর সইছে না।

যে ভাবে হন্তদন্ত হয়ে মালতীর ঘরের দিকে ছুটে এলেন বড় বৌঠান, তা'তে আর বুঝতে বাকী থাকে না যে, কিসের জন্য আর এক মুহূর্তও তর সইছে না এবং সইতে চাইছেও না এই বাড়ির মন।

বড বৌঠানের হাতে একটি লাল পেড়ে শান্তিপুরী শাড়ি, নতুন পয়সা-রঙের একটি ব্লাউজ, একটি সিল্কের সায়া, আর, আরও নানা রকমের মেয়েলী সাজের উপচার। মালতীর ঘরের দরজার কাছে এসে একবার হাঁপ ছাড়েন বড় বৌঠান, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাত-পায়ের উল্লাস যেন আপন খুশিতে ছটফটিয়ে ওঠে। এক ধাক্কায় ভেজানো কপাট ঝনঝনিয়ে খুলে দিয়ে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করেন বড় বৌঠান।—ধর ধর; শিগগির ধর। তোমাকে আর এক মুহূর্তও ঐ সাজে আমি থাকতে দেব না মেয়ে।

ঘরের জানালাটাকে খোলা পেয়ে বিকেলের একঝলক রোদও যেন সেই মুহূর্তে লুব্ধ হয়ে এসে লুটিয়ে পড়ে লালপেড়ে শান্তিপুরীর উপর। রঙীন হয়ে ওঠে মালতীর মুখ। দেখে মনে হয়, বিকেলের রোদ ঐ শান্তিপুরী লাল-পাড়ের আভা তুলে নিয়ে মালতীর মুখে মাখিয়ে দিয়েছে।

মালতীর ঐ সাদা সাজের রিক্ততা ধ্বংস ক'রে মালতীকে এই মুহূর্তে রঙীন করে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন বড় বৌঠান। বিশ বছর ধরে মালতীর জীবনের ঐ সাদাটে রূপ অনেক কষ্টে সহ্য করেছে এই বাড়ির মন। কিন্তু আর না। আর একমুহূর্তও না। মালতীর গায়ে ঐ সাদা থান আর সাদা আদ্দির জামাটাকে আর একমুহূর্তও দেখতে রাজি নয় এই বাড়ির কোন চক্ষু।

বড় বৌঠান বলেন—নাও নাও, হাত তুলে ধর, এখুনি প'রে ফেল।

কিন্তু বড় বৌঠান এত ব্যস্ত হয়ে উঠলেও মালতীর হাত দুটো হঠাৎ এত

ব্যস্ত হয়ে উঠবে কেমন ক'রে ? মালতীর মুখের উপর রঙীন আভা চমকে উঠলেও হাত দুটো যে বিশ বছরের অনভ্যাসের শাসনে কুণ্ঠিত হয়ে রয়েছে। আজ হঠাৎ লালপেড়ে শান্তিপুরীকে জীবনে বরণ ক'রে নেবার জন্য এত অলজ্জ ব্যস্ততা সে মেয়ের হাতে চঞ্চল হয়ে উঠবেই বা কি ক'রে, যে মেয়ের জীবন বিধবারই জীবনের মত আজ বিশ বছর ধ'রে সাদাটে রিক্ততার মধ্যে ডুবে রয়েছে ? ইচ্ছা থাকলেও হাত দু'টো যে লজ্জা কাটিয়ে উঠতে পারে না।

মালতী বলে—তুমি এ রকম ডাকাতের মত কাণ্ড কেন করছো বড় বৌঠান ? ওগুলো এখন রেখে দাও।

মালতীর কথাগুলিকেও বোধ হয় একটা লাজুক হাসির শিহর জড়িয়ে ধরছে। লালপেড়ে শান্তিপুরীকে বিছানার উপর রেখে চলে গেলেন বড় বৌঠান।

ঘুম ভেঙ্গে চোখ মেলে তাকাতেই চোখ থেকে স্বপ্ন সরে যায় ; এই তো ঘুমের জীবনের নিয়ম। কিন্তু মালতীর ভাবতে আশ্চর্য লাগে, তার জীবনটা বিশ বছরের ঘুম থেকে হঠাৎ জেগে উঠে চোখ মেলতেই দেখতে পেয়েছে, সেই স্বপ্ন যেন চোখ ছেয়ে ধরেছে। বিশ বছর পরে স্বামী ফিরে এসেছে যার, তার মন বিস্ময়ের আনন্দ সহ্য করতে গিয়ে একবার না কেঁদে থাকতে পারবেই বা কেন ? চোখ মুছে লালপেড়ে শান্তিপুরীর দিকে তাকায় মালতী। হেসে ওঠে মালতীর চোখ।

এ যেন নতুন ক'রে আর একবার ফুলশয্যার আহ্বান, একই প্রিয়জনের বুকের কাছে। বিশ বছর আগে এই বাড়িরই আর একটি ঘরে ঐ বৌঠানই ঠিক এমনি করে রঙীন শাড়ি হাতে নিয়ে মালতীর চোখের সামনে দাঁড়িয়ে, ঠিক এই রকমই ডাকাতের মত ভঙ্গীতে হুমকি দিয়েছিলেন। মালতীর সে দিনের মনের মিষ্টি বেদনা ওর চোখ দু'টোকে ঠিক এই রকমই ভিজিয়ে দিয়েছিল।

আজ বিশ বছর পরে ফিরে এসে উঠানের ঐ শেষ কোণের করবীর কাছে ঘরের ভিতরে বসে ছোট কাকার সঙ্গে এখন কথা বলছে যে মানুষটি, সে যে মালতীরই জীবনের এক ফুলছড়ানো উৎসবের উপহার, মালতীর স্বামী ইন্দুপ্রকাশ, যার কোল ঘেঁষে বসে জীবনের এক অদ্ভুত ভয় লজ্জা আর মধুরতা প্রথম সহ্য করেছিল মালতী।

ফিরে এসেছে মালতীর স্বামী। আজই এই বিকালে, মাত্র এই দশ মিনিট হলো পৌঁছেছে। আগেই জানা ছিল, ইন্দুপ্রকাশ আজ আসবে। বেশি দিন আগে নয়। মাত্র তিনদিন হলো। গত বুধবারের সন্ধ্যায় কলকাতা থেকে ইন্দুপ্রকাশের চিঠি পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন ছোটকাকা। তার পরেই দোতলার ঠাকুর ঘরে বেজে উঠলো শাঁখ। গঙ্গার এক ভাঙ্গা ঘাটের কাছে, ত্রিবেণীর এই পুরানো এক দালান বাড়ির বুকের ভিতরেই যেন এক উল্লাসের গঙ্গা হঠাৎ জোয়ারের ঢেউ আর কলোরোল ছড়িয়ে দিল।

আজ তিনদিন ধরে ঠানদি সেই একই কথা বার বার বলছেন—মালতীর তপিস্যের ফল ফললো। ফলবে না কেন? ভগবানই বোধ হয় মালতীর তপিস্যে দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছেন।

বাড়িয়ে বলেন নি ঠানদি। এই বিশ বছর ধরে মালতী যা করেছে, তাকে তপস্যাই বলতে হয়। ঐ একটি ছোট ঘরের ভিতরে বসে স্বামীর ফটো পূজা করেছে মালতী। সকাল সন্ধ্যা রাত্রি, স্বামীর ফটোর সম্মুখে বসে স্বামীর মুখ ধ্যান করেছে মালতী। মানুষ ওভাবে শুধু দেবতাকেই পূজা করতে পারে।

মালতীর এই ছোট ঘরের ভিতরে পূজার ঘরের গন্ধ থমথম করে। কখনো ধূপ জ্বলে, কখনো ধুনো পোড়ে, এবং কখনো বা জ্বলে কর্পূর। রক্ত-চন্দনে মাখা ফুলের স্তূপের মধ্যে স্বামীর ফটো। এই ফটো যেন মালতীর প্রাণের চেয়েও প্রিয় এক ইষ্টদেবতার বিগ্রহ; বিশ বছর ধরে মালতীর সকল ক্ষণের ভাবনা ও কল্পনার সেবা পেয়ে এসেছে।

বড় বৌঠান দেখে আশ্চর্য হয়েছেন, মাঝে মাঝে যখন রাতের বাতাসে সাদা করবীর ডালপালা বড় বেশি ছটফট করে, আর এক ফালি চাঁদের আলোতে ঝিকিঝিকি করে উঠানের স্যাঁতসেতে শ্যাওলা, তখন স্বামীর ঐ ফটোর দিকে তাকিয়ে গুনগুন ক'রে গান করে মালতী। বৈশাখের দুপুরে এক একদিন মালতীর ঘরে হঠাৎ ঢুকে দেখতে পেয়েছেন ঠানদি, চুপ ক'রে বসে মালতী তার স্বামীর ফটোকে আস্তে আস্তে পাখার বাতাস দিচ্ছে।

মালতীর এই তপস্যার অনেক আশ্চর্য রীতিনীতির মধ্যে যেটি সবচেয়ে বেশি আশ্চর্যকর, তার পরিচয়ও বুঝে ফেলতে দেরি হয়নি বড় বৌঠানের। বিছানার উপর মালতীর বালিশের পাশে আর একটি বালিশ। প্রতি রাত্রিতে ঐ বিছানায় মালতীর পাশে সত্যিই একজন শুয়ে থাকে, সে হলো

ঐ ফটো। ভোর হলেই স্বামীর ফটোকে বিছানা থেকে তুলে নিয়ে আবার রক্তচন্দন মাখা ফুলের স্তূপের মাঝখানে বসিয়ে দেয় মালতী।

বড় বৌঠানের সঙ্গে এই বিশ বছরের মধ্যে কতবার ঝগড়া করেছে মালতী।—আমার দিকে ওভাবে চোখ ছলছল ক'রে কখ্খনো তাকাবে না বড়বৌঠান। কে বললে আমি শূন্য হয়ে আছি? মিথ্যে কথা। আমি বেশ আছি। আমি স্বামীর সঙ্গেই আছি।

—তবে এসব অলক্ষুণে সাজ কেন? সধবা মানুষ সধবার মত সেজে থাকবে। থান কাপড় পরা তোমার একটুও উচিত নয় মালতী।

মালতী বলে—পূজো করতে হলে এই রকমেরই সাজ হওয়া উচিত।

সত্যিই ঐ সাদাটে থান হলো মালতীর পূজার সাজ, মালতীর মনের রঙীনতার বিরুদ্ধে মালতীর সুন্দর শরীরটার অভিযোগ যেন অভিমান ক'রে সাদাটে হয়ে গিয়েছে। সত্যিই বিধবা তো নয় মালতী, ওকে শুধু ঐ সাদাটে সাজের জন্য বিধবার মত দেখায়। কিন্তু ওর মনের সিঁথিতে সিঁদুর আছে, নিজেকে বিধবা বলে মনে করে না মালতী।

কিন্তু মালতীকে বিধবা বলে মনে করতে ইচ্ছা না করলেও মনে করতেই যে হয়। এই বিশ বছরের মধ্যে ছোটকাকা তাঁর মনের রাগ সহ্য করতে না পেরে ছোটকাকীর কাছে কতবার আক্ষেপ করেছেন—ওকে বিধবা সেজেই থাকতে দাও, থাকাই উচিত। স্বামী সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়া যা, স্বামী মরে যাওয়াও তা। তা ছাড়া, ইন্দু আজও সত্যিই বেঁচে আছে কিনা, তাই বা কে বলতে পারে?

আজ সেই ইন্দুই ছোটকাকার সঙ্গে ঐ ঘরের ভিতরে বসে গল্প করছে। এই বিশ বছরের মধ্যে শতবার খোঁজ করেও ইন্দুর কোন খবর এই ভারতের কোন প্রান্ত থেকেও পাওয়া যায় নি। হঠাৎ বিয়ের পর একমাস যেতে না যেতে সংসার ছেড়ে কোথায় যে চলে গেল মানুষটা! এত বিষয় আশয় যার, ত্রিশ বছর বয়েসের স্বাস্থ্যোজ্জ্বল এমন সুন্দর যৌবনের একটি তরুণ-রূপ এত শিক্ষিত একটি জীবন, কে জানে কোন্ এক বৈরাগ্যের তাড়নায় কুড়ি বছর বয়সের স্ত্রীকে সংসারজনতার মাঝখানে একলা জীবনের অভিশাপে স্তব্ধ ক'রে দিয়ে হঠাৎ পালিয়ে গেল! ছোটকাকা সেই দুঃখ সহ্য করতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন—ছি-ছি কোন্ এক বদ্ধপাগলের সঙ্গে মেয়েটার বিয়ে দিয়ে মেয়েটার সর্বনাশ করলাম!

আশ্চর্য, একেবারে সূর্য পশ্চিমে ওঠার চেয়েও আশ্চর্য, কুড়ি বছর বয়সের মালতীই ছোটকাকার কাছে এসে শান্ত দুই চক্ষুর দৃষ্টি তুলে বলে—তুমি মিথ্যে দুঃখ করছো কাকু। সে মানুষ বদ্ধ পাগল নয়, আর আমারও কোন সর্বনাশ হয়নি!

ছোটকাকা—তার মানে?

মালতী বলে—সে পালিয়ে যায়নি, আমি চলে যেতে দিয়েছি বলে সে যেতে পেরেছে।

ছোটকাকা—তাহলে বুঝলাম, তুইই একটা বদ্ধ পাগল। কোন্ বুদ্ধিতে তুই ইন্দুকে চলে যেতে দিলি? স্বামীকে গেরুয়া ধরতে সাহায্য করে যে মেয়ে, সে মেয়ের মাথা খারাপ হয়েছে নিশ্চয়।

ছোটকাকা বিশ্বাসই করতে পারেননি যে, মালতী শেষ পর্যন্ত সব রাগ অভিমান ছেড়ে দিয়ে, বেশ খুশি হয়ে ইন্দুকে চলে যেতে দিয়েছিল।

বিশ বছর আগের সেই রাত্রি, যে রাত্রিতে একটি ঘরের শান্ত নিভৃতে ফুলছড়ানো বিছানার উপরে বসেই প্রথম দেখতে পেয়ে চমকে উঠেছিল মালতী, ত্রিশ বছর বয়সের একটি সুন্দর মুখের উপর বসানো উজ্জ্বল অথচ ভেজা ভেজা দুটি চোখ মালতীর মুখের দিকে তাকাতে না পেরে অন্য দিকে তাকিয়ে রয়েছে। স্বামীর সেই চোখের ভাষা সেই রাত্রিতে কিছুই বুঝতে পারেনি মালতী, বুঝেছিল আর কয়েকদিন পরে। স্বামীর কথা শুনে আতঙ্কে শিউরে উঠেছিল, চেঁচিয়ে কেঁদে ফেলেছিল মালতী। এবং সব কথার আগে জ্বালাভরা আক্ষেপের মত অসহ্য এক অপমানের বেদনা ধিক্কার দিয়ে বেজে উঠেছিল মালতীর মুখে—তবে আমাকে বিয়ে করলে কেন? একমাস আগে ভগবানের টানে সংসার ছেড়ে গেলেই তো ভাল করতে।

হ্যাঁ, অপমান বৈকি। জীবনের প্রথম এক উৎসবের মাঝখানে যে মুহূর্তে আশা করছে মালতীর মন, পানের লালে রাঙানো তার পাতলা দুটি ঠোঁটের মায়া প্রথম জয়ের গর্বে আত্মহারা হবে, ঠিক সেই মুহূর্তে স্বামীর মুখের কথাগুলি যেন ধুলো ছিটিয়ে দিল মালতীর মুখের উপর।

ইন্দুপ্রকাশ বলে—ভেবেছিলাম, নিতান্তই ভুল ভেবেছিলাম যে, তোমার কাছে এসে দাঁড়ালে সংসারকে ভালবাসতেই ইচ্ছা করবে।

মালতী—সত্যিই ভালবাসতে ইচ্ছে করছে না?

ইন্দুপ্রকাশ—না মালতী।

মালতী—ভাল লাগছে না ?

ইন্দুপ্রকাশ—একটুও না।

মালতী—থাকলে খুব খারাপ লাগবে বলে ভয় হচ্ছে ?

ইন্দুপ্রকাশের চোখ দুটো আধমরা মানুষের অসহায় চোখের মত আনন্দ-হীন হয়ে যেন দুঃসহ এক ভয়ের দিকে তাকিয়ে কাঁপতে থাকে।—খুব খারাপ লাগবে। আর তুমিও আমাকে সহ্য করতে পারবে না।

মালতী—ভগবানকে খুঁজতে কোথায় যাবে তুমি ?

ইন্দুপ্রকাশ—কোথায় যাব বলতে পারি না, তবু জানি জীবনটাকে একেবারে একলা ক'রে দিয়ে ভগবানের কথা চিন্তা করবো।

আহত মানুষের মত ছটফট ক'রে হঠাৎ আবেদন ক'রে ইন্দুপ্রকাশ—ঐ একলা জীবনের আনন্দ আর শান্তির মধ্যে আমাকে চলে যেতে দাও।

অকস্মাৎ মালতীর চোখ দুটোও যেন সব জ্বালা হারিয়ে শান্ত হয়ে যায়। ত্রিশ বছর বয়সের এই সুন্দর একটি পুরুষের চোখের দৃষ্টিতে এ কী অদ্ভুত কাতরতা ? মুখের ভাষায় এ কী অদ্ভুত ব্যাকুলতা ! খেয়ালের ক্ষেপামি নয়, ইন্দুপ্রকাশের চোখে যেন কোন্ এক আকাশের হাতছানির ছবি চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সত্যিই যে এক মহাপুরুষের জীবনের সাধ মালতীর মত মেয়ের চোখের সামনে দাঁড়িয়ে মুক্তি প্রার্থনা করছে। অন্যায় হবে, পাপ হবে মালতীর, যদি এমন মানুষের জীবনকে একটা মেয়ের আলতা-সিঁদুরের কাছে জোর ক'রে বেঁধে রাখা হয়।

মালতী বলে তাহলে যাও।

ইন্দুপ্রকাশ—ওভাবে নয়, ক্ষমা ক'রে আর খুশি হয়ে আমাকে যেতে বল, তা না হলে চলে যাবার অধিকার আমার নেই।

হেঁট হয়ে ঝুঁকে পড়ে মালতীর মাথাটা। মাত্র একমাস হলো বিয়ে হয়েছে, কিন্তু এরই মধ্যে স্বামীর জীবনের উপর কত বড় অধিকার পেয়ে গিয়েছে মালতী ! নিজের মুখেই স্বীকার করেছে ইন্দুপ্রকাশ, মালতী খুশি হয়ে অনুমতি না দিলে এত বড় পুণ্যজীবনের পথে এক পা এগিয়ে যেতে পারছে না মালতীর স্বামী। কোথায় অপমান। অদ্ভুত এক গর্বে ও গৌরবে যে ভরে উঠলো মালতীর মন। যে মেয়েকে ভালবাসতে পারেনি, ভাল-বাসতে পারবে না বলেই ভয় করছে, সেই মেয়েকেই তুচ্ছতার বদলে শ্রদ্ধা দিয়ে অভ্যর্থনা করছে এক মহাপুরুষের মন। গঙ্গার জোয়ার যেন জলের

উপর নুয়ে পড়া একটা লতাকে বলছে, তুমি যেতে দাও; নইলে যেতে পারছি না।

চোখ মুছে হেসে ফেলে মালতী—যাও, খুশি হয়েই বলছি।

এর পর আর বোধ হয় মাত্র তিন-চারটে দিন মালতীর চোখের কাছাকাছি ছিল ইন্দুপ্রকাশ। শ্বশুরবাড়ির মানুষেরা হেসে মালতীকে কতবার প্রশংসা করেছে, এমন-কি ধন্যবাদও জানিয়েছে।

বড় জা বললেন—এবার আমরা নিশ্চিন্ত হলাম মালতী।

—কেন বড়দি?

—তুমিই পারবে, তুমিই ওকে ধরে রাখতে পারবে। যতই উদাস মানুষ হোক, তোমার ঐ মুখটির মায়া তুচ্ছ ক'রে আর সন্ন্যাস নেবার জন্য ছুটতে পারবে না।

—আগেও ছুটতে চেষ্টা করেছিলেন নাকি?

—কতবার চেষ্টা করেছে। ওর মনটাই যেন কি রকমের। আর সেই জন্যই তো, ওর সব চেষ্টার ইতি ক'রে দেবার জন্য তোমার মত এক রূপেশ্বরীকে নিয়ে এসেছি।

—ভুল করেছেন।

রাগ করে নয়, হেসে হেসে বড় জা-এর সব কথার উত্তর দিয়ে চলে যায় মালতী। ঘরের ভিতর যখন একলা হবার সুযোগ পায়, তখন মনে মনে প্রার্থনা করে মালতী—যেন শেষ পর্যন্ত মনের জোর থাকে। ঐ মানুষকে যেন খুশি মনে চলে যেতে দিতে পারি।

জানতেও পারেনি মালতী, সেদিনের কখন ঠিক কোন্ সময়ে চলে গেল ইন্দুপ্রকাশ। সকাল হতেই ইন্দুকে আর বাড়ির ভিতরে কোথাও কেউ দেখতে পায়নি। যখন বিকাল হলো, তখন মালতীরই টেবিলের এক কোণ থেকে একটি চিঠি তুলে নিয়ে পড়ে ফেলেই চেঁচিয়ে উঠলেন বড় জা। তারপর বাড়ির আর সবাই। রাত দুপুর পর্যন্ত চাপা কান্নার রোলে যেন গলে পড়তে থাকে কলকাতার সেই বাড়ির বাতাস। কিন্তু মালতী তার একলা ঘরের ভিতরে আলোর সামনে বসে শুকনো খটখটে দু'টি চক্ষু নিয়ে শান্তভাবে তাকিয়ে থাকে একটি ফটোর দিকে। মসৃণ কাগজের বুকে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে রয়েছে মালতীর স্বামী ইন্দুপ্রকাশের ছবি। বড় বড় দুটি টানা চোখে যেন একটা আচমকা বিস্ময়ের গভীর ছায়া। পিছনে টেনে আঁচড়ানো চুলের স্তবক

ফেঁপে রয়েছে। শুধু ঠোঁটের রেখায় নয়, চিবুকের দু'পাশে ছোট্ট ছোট খাঁজের মধ্যেও যেন মৃদু হাসির একটি মিষ্টি শিহর ফুটে রয়েছে।

যাবার আগে ঐ চিঠিটা মালতীরই জন্য লিখে গিয়েছিল ইন্দুপ্রকাশ, এবং সেই চিঠির কয়েকটা কথা মনে পড়তেই আপন মনে হেসে ওঠে মালতী।

—যদি কোন দিন বুঝতে পারি যে, তোমার কাছে গিয়ে থাকতে ভাল লাগবে, তবে আমি তোমার কাছে ফিরে যেতে এক মুহূর্তও দেরি করবো না। মনের মধ্যে ফাঁকি রেখে আমি ভুয়ো সন্ন্যাসী হতে পারবো না।

মনে মনে হেসে যেন ইন্দুপ্রকাশের মনটাকে ঠাট্টা করে মালতী। এক মাস ধরে যে মেয়েকে চোখের সামনে পেয়েও তার কপালের কুঙ্কুমের ফোঁটার দিকে তাকাতে পারলেন না, এক মুহূর্তের মতও ভাল লাগলো না যে মেয়েকে, দূরে চলে গিয়ে সেই মুখটাকে যে মনেও করতে পারবে না ঐ মানুষ, ভালো লাগা তো একেবারে অসম্ভবের গল্প।

বেশ তো, ভালই তো, তুমি তোমার চোখে পুরুষের দৃষ্টির বদলে মহা-পুরুষের দৃষ্টি পেয়েছ। তুমি তোমার একলা জীবনের শান্তি নিয়ে আনন্দভরা এক আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সুখী হও। ভালই করেছি, বাধা দিইনি তোমাকে। কিন্তু আমি তো মহামানবী নই, আমি তোমার ঐ মুখটিকেই যে ভালবেসে ফেলেছি।

অনেক রাত। আবছা ঘুমের মধ্যে চোখ বন্ধ ক'রে যেন বিড় বিড় করে মালতী। তারপর চমকে উঠেই আলো জ্বালে, আর অপলক চোখের তৃষ্ণা নিয়ে ফটোর দিকে তাকিয়ে থাকে, জীবনের প্রথম ভাললাগা একটি মুখের ছবির দিকে।

কদিন পরেই শ্বশুরবাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে ত্রিবেণীর বাড়িতে চলে এল মালতী এবং তারপর এই বিশ বছর ধরে অক্ষান্ত অক্লান্ত এক ফটোপূজার জীবন এবং তারপর এই বিকাল। রঙীন হয়ে ফুটে উঠেছে বিকালের মালতীর মন।

ফুটে উঠবেই বা না কেন? ঠানদি বলেন, এতদিনে মালতীর তপিস্যের ফল ফলেছে। কিন্তু মালতী যে বিশ্বাস করছে, এতদিনে জয়ী হয়েছে মালতীর কপালের সেই কুঙ্কুম। মালতীর মত মেয়ের মনের সাধ আর কাজলকালো চোখের মায়া ছেড়ে দূরে-সরে থাকা একলা জীবনের দুঃসহতা

থেকে ছুটে চলে এসেছে মালতীরই স্বামী। মালতীর কাছে থাকতে ভাল লাগবে, সেই ভাল লাগার জন্য লুব্ধ হয়ে ফিরে এসেছে সেই মানুষ।

মন ভরে এই অহংকার নিয়ে আজ খেলা করতে পারে মালতী। ছোট একটা লতার মত মানুষ হয়েও গঙ্গার জোয়ারকে ফিরিয়ে আনবার আর বেঁধে রাখবার মত শক্তি তার আছে। নইলে আনন্দভরা আকাশের লোভ ছেড়ে দিয়ে মালতীর মায়াভরা চোখের কাছে বাঁধা পড়বার জন্য ছুটে আসবে কেন এ'রকম এক মানুষ?

সন্ধ্যা হতে আর দেরি নেই। বড় বৌঠানও বোধহয় তাড়া দেবার জন্য ছুটে আসছেন। লালপেড়ে শান্তিপুরীর দিকে একবার তাকিয়েই ফটোর দিকে তাকায় মালতী। রক্তচন্দন মাখানো ফুলের স্তূপের মধ্যে বসে এখনও চোখে সেই গভীর বিস্ময়ের ছাপ নিয়ে হাসছে ইন্দুপ্রকাশের চিবুকের দুই পাশে দুটি ছোট্ট খাঁজ। এই ফটোর সঙ্গে বিশ বছরের কত সন্ধ্যায় মনে মনে কত কথা বলেছে মালতী। আজ এই মুহূর্তে মুখের হাসি দুহাতে চেপে, ভ্রূকুটি ক'রে আর ধমক দিয়ে শুধু বলতে ইচ্ছা করে—এতদিন পরে মনে পড়লো আর সময় হলো তোমার? হঠাৎ এসে সারা বাড়ির মনকে ব্যস্ত ক'রে দিয়ে, মালতীকে বিশ্রী লজ্জা পাইয়ে দিয়ে···দুষ্টু···অসভ্য··· লোভী কোথাকার!

বাড়ির ভিতরে উৎসবের মত চাঞ্চল্য। নানা জনেব মুখে মুখে, এঘর থেকে ওঘরে কত রকম কলরবেব ভাষা ছুটাছুটি করে। ছোটকাকীর সঙ্গে বড় বৌঠানের কথাবার্তার কিছু কিছু সরব স্পর্শ এই ঘরের ভিতরে মালতীর কানের কাছে এরই মধ্যে পৌঁছে গিয়েছে। শুনে নাকি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছেন জামাই, বিশ বছর ধরে স্বামীর ফটো পূজা করেছে মালতী। মালতীর চোখ দুটোও চঞ্চল হয়ে ওঠে। এখনি গিয়ে একবার আড়ালে দাঁড়িয়ে ইন্দু-প্রকাশের বড় বড় সেই উজ্জ্বল চোখের আশ্চর্যকে দেখে আসতে ইচ্ছা করে।

এরই মধ্যে বাড়ির লোকের কথাবার্তার টুকরো টুকরো আভাস পেয়ে আরও অনেক কথা জেনে ফেলতে পেরেছে মালতী। সত্যিই সন্ন্যাসী হতে পারেনি ইন্দুপ্রকাশ, বার বার সন্ন্যাস নেবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু বার বার সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। কেন? কিসের জন্যে? বার বার মালতীর কথাই মনে পড়েছে, তাই। জোর করে মনকে ফাঁকি দেবার আর চেষ্টা না ক'রে শেষ পর্যন্ত মালতীকে দেখবার জন্যই ফিরে এসেছে ইন্দুপ্রকাশ। মনে মনে

আবার হেসে ফেলে মালতী, আমার মনটা যেমন ভূয়ো বিধবা, তেমনি তোমার মনটাও যে একটা ভূয়ো সন্ন্যাসী।

উঠানের উপরেই যেন নতুন এক কণ্ঠস্বরের রেশ ভেসে বেড়ায়। শুনতে পেয়েই চমকে ওঠে মালতীর কান, তার চেয়ে বেশি চমকে ওঠে চোখের এক পিপাসা। ঘরের জানলার কাছে আড়াল হয়ে শুধু চোখের দৃষ্টিটাকে দুর্বার এক কৌতূহলের আবেগে উঠানের দিকে ভাসিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মালতী। ঠিকই বুঝতে পেরেছে মালতী, ছোটকাকার সঙ্গে গল্প করতে করতে উঠানের উপর পায়চারী করছেন মালতীরই স্বামী ইন্দুপ্রকাশ। বারান্দা থেকে বেলোয়ারী ঝাড়ের রঙিন কাঁচের ঝালর কেঁপে কেঁপে আলো ছড়াচ্ছে উঠানের উপর।

হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায় মালতীর চঞ্চল চোখের আবেগ। কে এই ভদ্রলোক? হাঁ, ইন্দুপ্রকাশই বটে, কিন্তু কত চেষ্টা ক'রে চিনতে হয়। চিবুকের দুপাশে সেই মিষ্টি হাসির খাঁজ দুটো ভরে গিয়ে একেবারে গম্ভীর হয়ে গিয়েছে। পিছনে টেনে আঁচড়ানো সেই চুলের ফাঁপানো স্তবক কী অদ্ভুতভাবে মিইয়ে গিয়েছে। তার মধ্যে সাদা চুলের ছিটেও যে স্পষ্ট দেখা যায়। বেশ সৌম্য ও শান্ত এক ভদ্রলোকের বেশ রাশভারি একটি শরীর আস্তে আস্তে ছোট-কাকার পাশে পাশে হেঁটে বেড়াচ্ছে।

জানালা বন্ধ ক'রে দেয় মালতী। নিথর হয়ে চুপ ক'রে বসে থাকে। এ কী বিশ্রী অস্বস্তি। মালতীর বুকের ভিতর লোভচঞ্চল নিঃশ্বাসগুলিই যেন হঠাৎ ঠেকে গিয়ে হাঁসফাঁস ক'রে কাতরাতে আরম্ভ করছে। বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ে মালতী।

দরজার কপাট ঝনঝনিয়ে ঠেলে দিয়ে ঘরে ঢোকেন বড় বৌঠান।—এ কি, তুমি আজও আমার কথার অবাধ্যতা করছো মেয়ে? এখনো ঐ অদ্ভুত সাজ ছাড়লে না?

মালতী বলে—আমাকে কিছুক্ষণ একা শুয়ে থাকতে দাও বড় বৌঠান।

বড় বৌঠান হাসেন—একা শুয়ে থাকবার অনেক সময় পাবে, এখন মাত্র সন্ধ্যা। তুমি শুধু এই শান্তিপুরীটা পরে মাথায় একটু সিঁদুর ঘষে নিয়ে আমার সঙ্গে চল।

—কোথায়?

—ওই ঘরে জামাইকে একটি প্রণাম করে এখনি চলে আসবে। তারপর একা শুয়ে থাক না রাত দশটা পর্যন্ত, কেউ বাধা দেবে না।

—এখন থাক বড় বৌঠান।

—কেন?

মালতী চেঁচিয়ে ওঠে—রাত দশটার পরেও তো প্রণাম করতে পারা যায়, তাতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হবে?

—বেশ তাই করো। কথাগুলি বেশ অপ্রসন্ন স্বরে বলতে বলতে চলে যান বড় বৌঠান।

সন্ধ্যাটা মোটেই বিষণ্ণ নয়, কিন্তু বড় বিষণ্ণ এই সন্ধ্যার মালতী। লাল পেড়ে শান্তিপুরী বিছানারই এক কোণে চুপ করে মালতীর শরীরটাকে জড়িয়ে ধরবার জন্য ওৎ পেতে অপেক্ষা করছে। দেখতে ভয় করে, এক ঠেলা দিয়ে ঐ লাল পেড়ে শাড়িটাকে সরিয়ে দিতে ইচ্ছে করে। সন্ধ্যার মালতীর মুখে সেই রঙীন আভার কোন চিহ্ন নেই। সন্ধ্যার মালতীর মন যেন স্বপ্ন হারিয়ে তার জীবনের এক রিক্ততার দিকে তাকিয়ে বিশ বছরের ক্লান্তি নিয়ে হাঁপাতে থাকে। স্বামী নামে এক গুরুজন এসেছেন এতদিন পরে। তাঁকে শুধু প্রণামই করা যায়, এবং শুধু প্রণাম করতে হলে লালপেড়ে শান্তিপুরী পরবার কোন দরকার হয় না।

সন্ধ্যার মালতীর মন যেন ভার সইতে না পেরে আর্তনাদ করে উঠতে চায়। মনে হয়, না এলেই ভাল করতেন ভদ্রলোক। এলেনই যদি তবে ওরকম একটি মূর্ত্তি নিয়ে কেন এলেন? মহাপুরুষ হতে না পেরে একেবারে যে কাপুরুষ হয়ে ফিরে এসেছেন ভদ্রলোক।

মালতীর জীবনের সেই অসমাপ্ত ফুলশয্যার আশা যে এই বিশ বছরের রক্তচন্দনের স্পর্শে আরও সুরভিত হয়ে উঠেছে। সেই আশার নিবেদন ঐ ভদ্রলোকের চোখের কাছে নিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেই বা কি হবে? কি বুঝবেন, কতটুকুই বা বুঝতে পারবেন ভদ্রলোক? মালতীর মুখের দিকে তাকিয়ে ঐ গাম্ভীরতার চক্ষে সেই আগ্রহ কতটুকুই বা দুরন্ত হয়ে উঠতে পারবে? মালতী যার মনের সব মুগ্ধতা দিয়ে বিশ বছর ধরে যার মূর্তিকে বুকের কাছে রেখে যার রক্তের উত্তাপ দিয়ে পূজা করে এসেছে, সে মানুষ ঐ মানুষ নয়।

ফটোর দিকে তাকায় মালতী। ঐ তো সেই মুখ, চিবুকের দুপাশে টোল খাঁজের মধ্যে মিষ্ট হাসির শিহর ফুটে রয়েছে। এই বিশ বছরের মধ্যে

কম করেও মালতীর তপ্ত ঠোঁটের হাজার ছাপ পড়েছে ছবির ঐ চিবুকের উপর। এর বদলে·· না অসম্ভব · অসাধ্য, ভাবলে গা বমি বমি করে, মালতী তার এই মুখকে একটা নতুন লোকের রাশভারি চোখের গম্ভীর আগ্রহের কাছে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না।

রাত দশটা। রাতের মালতীর মন যেন মরিয়া হয়ে বিদ্রোহ করবার জন্য তৈরী হয়ে উঠেছে।

ঝনঝনিয়ে কপাট ঠেলে ঘরে ঢুকলেন বড় বৌঠান। এবং ডাকাতেরই মত ভঙ্গী ধরে হুমকী দিলেন—আর এক মুহূর্তও এভাবে পড়ে থাকতে পারবে না মেয়ে, ওঠ, শিগ্‌গির কর, মুখটা ধুয়ে নাও, ঝটপট পরে ফেল এই শান্তিপুরী।

লালপেড়ে শান্তিপুরী, নতুন পয়সা বের ব্লাউজ আর সিল্কের সায়া হাতে তুলে নিয়ে বেশ মিষ্টি গলা ক'রে আবার সাধতে থাকেন বড় বৌঠান, একটু তাড়াতাড়ি কর লক্ষ্মী, রাত হয়েছে অনেক, বেচারা একা ঘরের ভিতর বসে রয়েছে।

মালতী বলে—একটা প্রণাম করে আসতে হবে এই তো?

বড় বৌঠান হাসলেন—আসতে হবে মানে? প্রণাম করবে আর থাকবে। যদি বেশি লজ্জা করে তো বল আমিই না হয় এক ঠেলা দিয়ে ঘরের কোলের উপর বসিয়ে দিয়ে চলে আসবো। ঘরের কপাটে খিল দিতে লজ্জা যদি করে তো খিল দিও না। আমিই কপাটের বাইরের শিকল তুলে তালা বন্ধ ক'রে দেব।

মালতী -তা হতে পারে না।

বড় বৌঠান—তবে কি হতে পারে?

মালতী—আমি গিয়ে শুধু একটা প্রণাম ক'রে চলে আসতে পারি।

বড় বৌঠান -এই থান পরে?

মালতী—হ্যা।

বড় বৌঠান রাগ সামলাতে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন—খবরদার, ওভাবে তুমি যেতে পারবে না। বিশ বছর ধরে মিথ্যে থান পরে অনেক অভিমানের খেলা খেলেছ, আজ ঐ খেলা ভদ্রলোককে না দেখালেও চলবে।

হাত-পা গুটিয়ে বিছানার উপর স্থির হয়ে বসে থাকে মালতী। বড় বৌঠান কি যেন ভাবেন, তারপর বেশ শান্ত স্বরে বলেন—আচ্ছা বেশ, যদি

শুধু প্রণাম করেই চলে আসতে চাও তো তাই ক'রে এস। কিন্তু সিঁথিতে সিঁদুর ঘষে আর এই লালপেড়ে শান্তিপুরীটা পরে যাও।

মালতী বলে—না, তা হয় না। যদি যাই তো এই সাদা সাজেই যাব আর চলে আসবো।

বড় বৌঠান গলা ছেড়ে চিৎকার করেন।—আমি বলছি, তোমাকে এই লালপেড়ে শান্তিপুরী পরতে হবে, স্বামীর কাছে এখনই যেতে হবে, আর স্বামীর ঘরেই সারারাত থাকতে হবে। ভদ্রলোককে অপমান করবার তোমার কোন অধিকার নেই।

মালতী—না, পারবো না।

লালপেড়ে শান্তিপুরী হাতে নিয়ে জোর ক'রে পরিয়ে দেবার জন্য মালতীর কাছে এগিয়ে আসেন বড় বৌঠান, এবং মালতীর একটা হাত শক্ত ক'রে চেপে ধরেন।

বড় বৌঠানের হাত ছাড়িয়ে সরে যায় মালতী, চেঁচিয়ে ওঠে—আমাকে মেরে ফেললেও আমি তোমাদের কথা শুনবো না।

লালপেড়ে শান্তিপুরী যেন একটা রক্তমাখা খড়্গ, মালতীর বিশ বছরের স্বপ্নকে একটা ভুল দেবতার তৃপ্তির কাছে বলি দেবার জন্য বড় বৌঠানের হাতে হিংস্র আহ্লাদে দুলছে। মেজের উপর লুটিয়ে বসে পড়ে নিজেরই দুই হাঁটু শক্ত ক'রে জড়িয়ে ধরে মালতী।

বাড়ির রাত দশটার নীরবতা যেন হঠাৎ উদ্বেগে বিচলিত হয়। মালতীর ঘরের ভিতরের এই হঠাৎ চিৎকারের অর্থ বুঝতে না পেরে সবার আগে ছুটে আসেন ঠানদি। তারপর আর সবাই। ছোটকাকা আসেন, ছোটকাকী আসেন, বড়দাও ব্যস্তভাবে এসে দাঁড়ালেন—ব্যাপার কি?

বড় বৌঠান বলেন—ঐ অলক্ষুণে সাজ ছাড়বে না, আর জামাই-এর কাছে যেতেও চাইছে না এই মেয়ে।

কিন্তু সেই মুহূর্তে বড়দা হঠাৎ অপ্রস্তুত হয়ে সরে যান। ছোটকাকা হঠাৎ লজ্জিতের মত হাত কাঁপিয়ে চশমা মুছতে থাকেন এবং ছোটকাকী আর বড় বৌঠান মাথার কাপড় টানেন। নিঃশব্দ ছায়ার মত এসে সকলের পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে ইন্দুপ্রকাশ।

ইন্দুপ্রকাশ হাসতে হাসতে বলে—আপনারা যদি এখন চলে যান,

তাহলে আমিই বরং মালতীকে কয়েকটা কথা বলি, এত গণ্ডগোলের কোন মানে হয় না।

ঘর ছেড়ে চলে যায় সকলেই। ঠানদি শুধু যেতে যেতে বলে যান—যার জিনিস সে-ই এখন বুঝে নিক, তাই ভালো।

গঙ্গার জলো ঠাণ্ডা গায়ে মেখে নিঝুম হয়ে রয়েছে ত্রিবেণীর চৈত্রমাসের মাঝ-রাত। সারা বাড়ির মধ্যে আর কোন শব্দের সাড়া নেই। মেজের উপর লুটিয়ে বসে তেমনি শক্ত ক'রে দুই হাঁটু জড়িয়ে আর মুখ লুকিয়ে বসে থাকে মালতী। দরজার কাছে যেন হঠাৎ এসে দাঁড়িয়েছে জীবনের অজানা আর মনের অচেনা একটা নতুন মানুষের ছায়া, এখনি ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়বে। গা সির সির করে মালতীর। দম বন্ধ ক'রে দুঃসহ মুহূর্তগুলিকে কোনমতে সহ্য করে মালতী।

কিন্তু মালতীর ঘরের ভিতরে ঢোকে না ইন্দুপ্রকাশ। চুপ ক'রে দরজার কাছে বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে থাকে।

মালতী যেন তার কাণ দুটোকেও একটা বধিরতার মধ্যে লুকিয়ে ফেলতে চায়। যেন শুনতে না হয় এই ভদ্রলোকের কোন গম্ভীর লোভের হা-হুতাশ আর কাতরানির শব্দ। দু'হাতের বেড়ার মধ্যে একেবারে কান সুদ্ধ মাথাটাকেই লুকিয়ে ফেলে মালতী।

কিন্তু কোন কথা বলে না ইন্দুপ্রকাশ। নিজের অস্তিত্বটাকে সত্যিই যেন ছায়ার মত একেবারে শব্দহীন ক'রে দিয়ে শুধু দাঁড়িয়ে থাকে ইন্দুপ্রকাশ এবং বোধ হয় বুঝতেও পারে না যে, নিঝুম রাতও যে প্রায় শেষ প্রহরে এসে শেষ ঘুমের ক্লান্তিতে একেবারে ঢলে পড়েছে।

মালতীর চোখের আর কানের উদ্বেগও বোধ হয় এই একটানা অবাধ নিঃশব্দতার মধ্যে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ চমকে ওঠে মালতীর মন। সে ছায়া কি এখনো আছে, না চলে গিয়েছে? চলেই গিয়েছে বোধ হয়।

মাথা হেঁট ক'রে রেখে আর চোখ না তুলেও চকিতে একবার দরজার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে মালতী, সে ছায়া এখনো দাঁড়িয়ে আছে।

কিন্তু কথা বলে না কেন? কয়েকটি কথা বলবার জন্য কয়েকটি ঘণ্টা চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে নষ্ট ক'রে দিলেন ভদ্রলোক। তবে কি সত্যই কথা বলতে আসেননি? তবে কেন এসেছেন? শুধু কি দেখে যেতে? কিন্তু কি, কি দেখতে, কি দেখলেন ভদ্রলোক?

মুখ তুলে আর চোখ তুলে ইন্দুপ্রকাশের মুখের দিকে তাকায় মালতী।

ইন্দুপ্রকাশ বলে—তোমাকে দেখতে এসেছি, এতক্ষণে দেখতে পেলাম মালতী।

মালতী মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে তাকায়।

ইন্দুপ্রকাশ বলে—ওঁরা যাই বলুন না কেন, তুমি ভুল করো না মালতী। লালপেড়ে শান্তিপুরী পরে আমার কাছে আসা তোমার উচিত নয়!

মালতীর কাণ দুটো হঠাৎ অপ্রস্তুত হয়। এখনও যে মহাপুরুষেরই মত কথা বলছেন ভদ্রলোক।

ইন্দুপ্রকাশ—যে যাই বলুক, আমাকে তোমার প্রণাম করাও উচিত নয়।

কেন? মালতীর মনের ভিতরে বিস্মিত একটা প্রশ্ন চমকে ওঠে। মনে হয়, মালতীকে একা ফেলে রেখে বিশ বছর ধরে পালিয়ে থাকা জীবনের ভুল আর ত্রুটির জন্য অনুতাপ প্রকাশ করছেন ভদ্রলোক।

ইন্দুপ্রকাশ—বিশ বছর ধরে নিজের মনের ফাঁকির সঙ্গে লড়তে লড়তে হয়রান হয়ে গিয়েছি। বুঝতে পেরেছি তোমাকে বড় বেশি ভাল লাগবে বলে ভয় পেয়েছিলাম বলেই সেদিন পালিয়ে গিয়েছিলাম, সেদিন নিজেকে নিজেই চিনতে পারিনি।

অবিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু মালতীকে ভাল লাগবে বলে মনে ক'রে এভাবে আর ঐ চেহারা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালে মালতীর ভাল লাগবে কি না, এই প্রশ্নের ভয় নেই কেন এই ভদ্রলোকের মনে? ভদ্রলোকের একটা পুরনো লোভের এই হা-হুতাশ শুনতে একটুও ভাল লাগে না মালতীর।

ইন্দুপ্রকাশ বলে—কিন্তু আজ ভয় পেয়েছি মালতী, বুঝতে পারছি না, সত্যই তোমাকে ভাল লাগবে কি?

মালতীর চোখ দুটো হঠাৎ বিশ বছর আগের সেই দিনের আহত ও অপমানিত চোখের মত দপ্ ক'রে চমকে ওঠে। আবার সেই কথা নির্বোধের মত নিজের মনকে ফাঁকি দেবার কথা।

ইন্দুপ্রকাশ—আমি আশা করেছিলাম, আমি আবার সেই মালতীর চল্লিশ বছর বয়সের জীবনটাকে বুকে জড়িয়ে শান্তি পাব।

মালতীর ঘুমন্ত চোখের উপর যে যেন হঠাৎ একটা আঘাত আছড়ে দিল, তাই যন্ত্রণাক্ত হয়ে ছটফট করতে থাকে মালতীর চোখ। কেঁপে ওঠে

মালতীর হাতটা। সাদা থানের আঁচলটাকে গায়ের উপর ভাল ক'রে জড়িয়ে ধরে রাখে মালতী। যেন এতক্ষণে চোখে পড়েছে, বিশ বছর পর হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে মালতী তার চল্লিশ বছরের বয়সটাকে দেখতে পেয়েছে। ছিঃ, এমন করেও নিজের বয়স ভুলে যায় মানুষ!

ইন্দুপ্রকাশ হাসে—তোমার চেহারা কত বদলে গিয়েছে মালতী। তুমি আর সেই রকম সুন্দর নও, কিন্তু···।

হঠাৎ বিব্রত ভাবে, যেন ভয় পেয়ে কিংবা অদ্ভুত এক লজ্জার ভয় সইতে না পেরে মাথার উপর সাদা থানের আভরণ টেনে দেয় মালতী।

ইন্দুপ্রকাশ বলে—কিন্তু আর এক রকমের সুন্দর তো বটেই।

মালতীর চোখ ফুটে জল উথলে উঠবে বোধ হয়। মুখ ঘুরিয়ে নেয় মালতী।

ইন্দুপ্রকাশ—লোকে বলছে, তুমি বিশ বছর ধরে স্বামীর ফটো পূজো করেছ, কিন্তু লোকের কথা বিশ্বাস করো না মালতী।

—কেন? মালতীর মুখে প্রশ্নটা যেন দপ ক'রে জ্বলে ওঠে। মালতীর জীবনের সবচেয়ে বড় গর্বের উপর আঘাত পড়েছে।

ইন্দুপ্রকাশ—স্বামীকে নয়; তুমি ত্রিশ বছর বয়সের একটি ছেলেকে আজও পূজো করছো মালতী।

মালতী—আমার স্বামীরই ত্রিশ বছর বয়সের মূর্তিকে পূজো করছি।

ইন্দুপ্রকাশ—না, তুমি তোমার স্বামীর ত্রিশ বছর বয়সটাকেই শুধু পূজো করছো। তাই···তাই বলছিলাম, আমাকে তোমার প্রণাম করা উচিত নয়। আমি তোমার প্রণাম নেবই বা কেন?

স্তব্ধ হয়ে যায় মালতীর সব মুখরতা। নিথর হয়ে সাদা থানের আঁচলে মুখ ঢেকে চুপ করে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে মালতী। তারপর কি যেন বলবার জন্য আস্তে আস্তে আঁচল সরিয়ে মুখ তুলে তাকায়।

কিন্তু সে-কথা আর বলা হলো না। নেই, দরজার কাছে কোন ছায়া নেই! চলে গিয়েছে ইন্দুপ্রকাশ।

কিন্তু যাবে কোথায়? মালতীর দু'চোখে যেন নতুন এক প্রতিজ্ঞার আক্রোশ ছটফট করে।

কিন্তু ভোর হয়ে এলো যে!

ভোরের মালতীর চোখে জল।

ফটোর দিকে চেয়ে বসে আছে মালতী। রক্তচন্দন মাখানো ফুলের স্তূপের মধ্যে ত্রিশ বছর বয়সের একটা মুখ মালতীর চল্লিশ বছর বয়সের ভারে অলস দেহের দিকে তাকিয়ে হাসছে। মালতীর মনের বিচিত্র লোভগুলিকে যেন ঠাট্টা করছে সেই হাসি, ছিঃ, চটফট ক'রে ওঠে মালতীর হাতটা। সেই মুহূর্তে ফটোটাকে তুলে নিয়ে টেবিলের দেরাজের ভিতরে বন্ধ করে মালতী।

এখনই পাখি ডেকে উঠবে যে!

লালপেড়ে শান্তিপুরীর দিকে তাকায় মালতী। সিঁদুরের কৌটা খোঁজে মালতী। নতুন পয়সা রঙের বাউজ আর সিল্কের সায়া, মন্দ কি? টিপের কুঙ্কুম গেল কোথায়? দেখতে দেখতে আবার বাসন হয়ে ফুটে ওঠে ভোরের মালতীর রূপ। নতুন ক'রে আবার এক ফুলশয্যার আশা সত্যিই যে মালতীর মনে ডাক দিয়েছে। ব্যস্ত হয়ে ওঠে, দুই হাতকে দুরন্ত উৎসাহে মাখি ঘষে তাড়াতাড়ি বাসন সাজে সেজে উঠতে থাকে মালতী।

গঙ্গার শান্ত ঘাটের উপর জলের আয়নায় অদ্ভুত এক উচ্ছলতার শব্দ ছড়ায় বাতাস। ভোর হয়ে এসেছে। চাদর হাতে নিয়ে দরজার কাছে এগিয়ে আসতেই থমকে দাঁড়ায় ইন্দুপ্রকাশ। লালপেড়ে শান্তিপুরীর আভা জড়িয়ে একটা বাবা দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে।

—এ কি মালতী?

— আমি মালতী ঠিকই, কিন্তু তুমি কি?

উত্তর দেয় না ইন্দুপ্রকাশ। ঘরের ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে দেয় মালতী।

ইন্দুপ্রকাশের বিস্মিত দুই চক্ষুকে আরও বিস্মিত করে দিয়ে মালতী বলে তুমি মহাপুরুষ নও। তুমি পুরুষ।

—হ্যাঁ। তাই তো তোমার কাছে ফিরে এসেছিলাম।

ছলছল করে মালতীর দুই চোখ। তবে লালপেড়ে শান্তিপুরীর দিকে তাকিয়ে এখনও চুপ ক'রে রয়েছে কেমন ক'রে?

—কিন্তু তোমার চোখে আমি যে নিতান্ত ...।

—তুমি ছেলেমানুষের চেয়েও হিংসুটে, সামান্য একটা ফটোকে হিংসে কর। লজ্জা করে না তোমার?

বলতে গিয়ে হেসেই ফেলে মালতী।

তারকবাবুরই চেষ্টায় জয়রামপুর নামে ছোট এই গঞ্জ নতুন একটা মর্যাদা লাভ করেছে। গঞ্জ জয়রামপুর এখন একটা মিউনিসিপ্যালিটি, আর তার প্রথম চেয়ারম্যানও হয়েছেন স্বয়ং তারকবাবু। তিনিই জয়রামপুরকে নানা ভাবে পরিচ্ছন্ন করেছেন। শুধু পথ-ঘাটের পরিচ্ছন্নতা নয়, জয়রামপুর থেকে নানা রকমের অসামাজিক নোংরামিও তিনি সরিয়ে দিয়েছেন। কানা খোঁড়া আর জরাগ্রস্ত অক্ষম ছাড়া আর কোন ভিখারীই জয়রামপুরে ভিক্ষে করার সুযোগ পায় না। তারকবাবুর ব্যবস্থা মতো, হয় তারা মাটি কাটে, নয় জয়রামপুর ছেড়ে পালিয়ে যায়।

শুধু পালিয়ে যায় না মথুরা, লেঠেলপাড়ায় খালের কিনারায় একটা শিমুল গাছের তলায় কুঁড়ে ঘরের ভেতরে থাকে যে মথুরা। রুগ্ন পাখির মতো জিরজিরে আর লিকপিকে চেহারা, গাঁজা খায় আর নিজেরই বাচ্চা ছেলেটাকে ভিক্ষেতে খাটিয়ে পয়সা রোজগার করে, সেই মথুরা, লেঠেল-পাড়ার সেই বিখ্যাত লেঠেলদের বংশধর। এখন ঐ শিমুলের তলায় মথুরার ঘরের ভিটাটিই সেই লেঠেল বংশের একটি মাত্র ভিটা, যেখানে আজও সন্ধ্যায় বাতি জ্বলে। মথুরা বলে,আমি নড়বো না,আমি আমার সাতপুরুষের ভিটাতেই থাকবো।

হ্যাঁ, তবে জয়রামপুর শহরের নতুন অনুশাসন মেনে নিয়েছে মথুরা। জয়রামপুরের কোন পথে পাড়ায় বা বাজারে আর ভিক্ষে করতে ভোলাকে পাঠায় না মথুরা। সকাল হলেই ভোলাকে সঙ্গে নিয়ে এক-একদিন শিমুল তলার কুঁড়ে থেকে বের হয় মথুরা। সাঁকো পার হয়ে, খোয়া বাঁধানো সড়ক পার হয়ে একেবারে মেঠো পথের উপর এসে দাঁড়ায়। চলে যায় নিকট ও দূর গাঁয়ের হাটে বাজারে ও মেলায়। সন্ধ্যা হলেই ফিরে আসে।

তারকবাবুর সন্দেহ মেটে না। মথুরাকে দেখতে পেলেই ধমক দেন।—তুই নিশ্চয় চারদিকের গাঁয়ে গাঁয়ে ছেলেটাকে ভিক্ষে করিয়ে পয়সা রোজগার করছিস।

মথুরা বলে—না কর্তা,বাপ-ছেলেতে মিলে গাঁয়ে গাঁয়ে কাজ করে বেড়াই।

তবু সন্দেহ মেটে না তারকবাবুর। কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন, সত্যিই নিকটের বা দূরের কোন গাঁয়ের বাজারে মথুরার বাচ্চা ছেলেটাকে ভিক্ষে করতে কেউ দেখেনি। থানার জমাদারও বলে, লোকটা চুরি-টুরি করে বলেও তো মনে হয় না। কিন্তু বেশ আছে গেঁজেল নিষ্কর্মা মথুরা। দম ভরে গাঁজা খায় আর গানও গায়। মন্দ নয় এই রহস্য, কিন্তু কেমন করে এটা সম্ভব হয়! ভিক্ষেও করে না, চুরিও করে না!

গাঁয়ের হাটের ভীড়ের মধ্যে মথুরা আর মথুরার ছেলে ভোলা প্রায় প্রতিদিনই ছদ্মবেশে একটা কাণ্ড বাধায়। কিন্তু এমনই সুন্দর ছদ্মবেশ যে, জয়রামপুরের মানুষও দেখে চিনতে পারে না, কে এরা, কোথা থেকে আসে আর কোথায় চলে যায়।

হাটের ভীড়ের মধ্যেই এক জায়গায় এক গাছের ছায়ায় এক কিশোর কৃষ্ণের মূর্তি কখনো নেচে নেচে, কখনো বাঁশী বাজিয়ে আর কখনো বা সুর করে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে একটা মন-মাতানো চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। ছয় সাত বছরের একটা ছেলে, সর্বাঙ্গে নীল রঙের আঠা মাখানো। পরনে হলদে রঙের একটা খাটো কাপড়, পায়ে নূপুর, মাথায় চুল ঝুঁটি করে বাঁধা, তার মধ্যে গোঁজা থাকে ময়ূরের পাখার একটা টুকরো, গলায় পাঁচ-মেশালি রঙীন বুনো ফুলের মালা, আর হাতে একটা বাঁশী।

পায়ের ঘুঙুর বাজিয়ে নেচে নেচে এক পাক ঘুরে নিয়ে এই শিশু কৃষ্ণটি সুর করে বলে—আমি বৃন্দাবনে ধেনু চরাবো, আমি রাখালরাজা। আমি বৃন্দাবনে বাঁশী বাজাবো, আমি রাখালরাজা।

দর্শক জনতা হেসে হেসে দেখতে থাকে। মন্দ সঙ নয়। কেউ বা ভক্তিবিহ্বল চক্ষে তাকিয়ে আর ভাবাবিষ্ট স্বরে বলে ওঠে।—আহা!

রাখালরাজা তার ছোট শরীরটা ত্রিভঙ্গিম করে গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে বুলি-শেখানো তোতার মত বলতে থাকে।—এই যে আমার মোহনবাঁশী, এই যে আমার বনমালা, এই যে আমার পীতধড়া।

হাতের বাঁশী নামিয়ে সোজা টান হয়ে দাঁড়িয়ে গম্ভীর মুখে রাখালরাজা আবার বলে—আমি কালীয়দমন, আমি কংসোনাসোন, আমি শ্রীহরি মুরারি।

বিচলিত হয় দর্শক জনতার বিহ্বল দৃষ্টি। রাখালরাজার পায়ের কাছে এক একটা পয়সা পড়তে থাকে।

দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এইভাবেই হাটের ভীড়ে এক কচি রাখালরাজার নাচ গান বুলি আর ভঙ্গীর খেলা চলতে থাকে। সন্ধ্যার অন্ধকার যখন ঘনিয়ে আসে, হাটের ভীড়ও ভাঙ্গতে থাকে, তখন দেখা যায় আর এক অদ্ভুত দৃশ্য। আর একটা রহস্যময় সঙ। বড় বড় সাদা চুলে ভরা মাথা, আর লম্বা লম্বা সাদা দাড়িতে বুক ঢাকা, একটা বুড়ো মূর্তি কোথা থেকে এগিয়ে আসে। সাদা পাট ও শণের পরচুলা পরে বুড়ো সেজেছে একটা লোক। লোকটা সুর করে ডাক দেয়—কোথারে বাপ রাখালরাজা, কোথারে নন্দের নন্দন।

জনতা সেই আবছা অন্ধকারেই দেখতে পায়, বুড়ো বাপ নন্দ এসে বাছা কেষ্টকে কোলে তুলে নিয়ে চলে গেল।

সেদিন ছিল রাজহাটির মাঘমেলা। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মেলার মাঝখানে গাছের তলায় দাঁড়িয়ে সেই অদ্ভুত সঙ, সেই ক্ষুদে এক রাখালরাজা তার নীল রঙের আঠা মাখানো চেহারা নিয়ে নাচলো গাইলো আর পয়সা পেল। সব শেষে তেমনি বড়ো নন্দ এসে বাছা কেষ্টকে কোলে তুলে নিয়ে চলে গেল।

মাঘ মাসের রাত, কনকনে ঠাণ্ডা, কুয়াশায় ঢাকা জয়রামপুরের লেঠেল-পাড়াও যেন ঘুমে নিথর হয়ে গিয়েছে। শুধু চোরের মত সতর্ক একটা অদ্ভুত মূর্তি এগিয়ে চলেছে খালের কিনারায় শিমুলতলায় কুঁড়ে ঘরের দিকে।

কুঁড়ে ঘরের দরজার কাছে অনেকক্ষণ থেকেই প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল থানার জমাদার। স্বচক্ষে দেখে নিজের মনের সংশয়টা চরমভাবে পরীক্ষা করে নেবার জন্যই জমাদার দাঁড়িয়ে আছে। সত্যই কি চুরি করে না মথুরা?

দপ্ করে জ্বলে ওঠে জমাদারের হাতের টর্চ। থমকে দাঁড়ায় মূর্তিটা।

দেখতে পায় জমাদার, কাঁধের উপর কাপড়ের খুট দিয়ে ঢেকে অতি মূল্যবান চোরাইমালের মত কি একটা বস্তু সন্তর্পণে বহন করে নিয়ে আসছে মথুরা। হাঁপাচ্ছে নিষ্কর্মা গেজেল মথুরার জিরজিরে পাঁজরা।

—চোর কোথাকার!

জমাদারের ধমক শুনে আস্তে আস্তে কাঁধের বোঝা মাটির উপর নামিয়ে রাখে মথুরা। কিন্তু দেখেই চমকে ওঠে জমাদার।—কি সর্বনাশ!

চোরাই মাল নয়, কিন্তু দেখতে তার চেয়েও ভয়ানক একটা বস্তু। নিবিড় ঘুমে অচেতন ক্ষুদ্র একটা উলঙ্গ শিশুশরীর, সর্বাঙ্গে নীল রঙের আঠা মাখানো।

জমাদার বলে—তুমিই বেটা নন্দ সেজে আর ছেলেটাকে কেষ্ট সাজিয়ে বাজারে বাজারে ভিক্ষে করে পয়সা রোজগার করছো?

শুকনো খটখটে দুটো চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে মথুরা, কোন উত্তর দেয় না।

হাত দিয়ে ভোলার ঘুমন্ত শরীরটাকে একবার নাড়াচাড়া করে পরীক্ষা করে জমাদার, সঙ্গে সঙ্গে শিউরে ওঠে।—ইস, ছেলেটার যে জ্বর হয়েছে রে।

তেমনি শুকনো খটখটে দুটো চোখ নিয়ে মথুরা তাকিয়ে থাকে। একটা নির্বোধ দৃষ্টি! নিজেরই ছেলে, শিশুশরীরের দিকে তাকিয়ে কোন মায়া বেদনা জাগে না যে চোখে, মদ্দা শ্বাপদের সেই চোখের মতো মথুরার চোখ দুটো জ্বলছে।

জমাদার বলে—এসব আর চলবে না মথুরা! তুমি বেটা ডবল পাপী। ছেলেটাকে দিয়ে ভিক্ষে করাচ্ছো, তার উপর কসাইয়ের মতো ছেলেটাকে প্রাণে মারছো। কালই ব্যবস্থা করছি।

পরদিনই ব্যবস্থা হয়ে গেল। তারকবাবুরই বৈঠকখানায় মথুরাকে ডাকিয়ে আনা হলো। পরামর্শ নেবার জন্য আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আহ্বান করা হলো।

তারকবাবু বললেন—একটা বাচ্চা ছেলের উপর এরকম নিষ্ঠুরতা চলতে দেওয়া উচিত নয়। আইন অনুসারে লোকটাকে জেলেও দেওয়া যায়। কিন্তু তারপর বাচ্চাটাকে নিয়ে সমস্যায় পড়তে হবে যে।

পাঁচজনে বলে—ছেলেটার ওপর নিষ্ঠুরতা আগে বন্ধ করুন। স্টুপিডটা ছেলের রোজগারে গাঁজা খায়, আর ছেলেটাকেই কষ্ট দিয়ে প্রাণে মারছে।

তারকবাবু বলেন—একটা উপায় বলুন।

সকলে বলে—মথুরাকেই কাজ করতে বাধ্য করা হোক্।

হেসে ওঠেন তারকবাবু—ওকি সেই চিজ? মরে যাবে তবু কাজ করবে না। চেষ্টা কি করিনি আমি?

একটু চুপ করে থেকে তারকবাবু আবার বলেন—তাছাড়া, ঐ লিকলিকে গেঁজেলের শরীরে কি আর কাজ করার সামর্থ্য আছে?

জমাদার বলে—তাহলে ছেলেটাকে একটা কাজ দেওয়া হোক, যে কাজ ওর পক্ষে সাজে।

তারকবাবু—হাঁ আমিও তাই ভাবছি। ছেলেটা এখন থেকেই ভিক্ষে শিখেছে, তাও আবার কেষ্ট সেজে লোক-ঠকানো ভিক্ষে, এটা ঠিক নয়। কিন্তু।

কিন্তু কি করা যায়? সমস্যাটা একটু জটিলই বটে। ছয়-সাত বছর বয়সের একটা বাচ্চাকে কাজ দিতে হবে, আর সে-কাজটার মধ্যে যেন কোন কঠোরতা আর নিষ্ঠুরতা না থাকে, সে-কাজ যেন ছেলেটার শরীরে আর শক্তিতে কুলোয়।

সকলেই বলে—আপনি দয়া করলে একটা ব্যবস্থা হয়েই যাবে তারকবাবু।

তারকবাবু বলেন—আমার সাঁওতাল রাখালটা কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে গিয়েছে।

সকলে একসঙ্গে বলে—এই তো, ভাল কাজ। গাঁয়ের বাচ্চা বাচ্চা ছেলেগুলিই তো গরু চরায়। মথুরার ছেলেটাকে লাগিয়ে দিন এই কাজে।

তারকবাবু বলেন—করুক্। রোজ এক পো চাল আর নগদ এক আনা পাবে।

জমাদার খুশি হয়ে হাঁক দেয়—শুনলি তো মথুরা।

মথুরা তখুনি হাত-জোড় করে প্রস্তাব মেনে নেয়।—শুনেছি হুজুর। আপনাদের দয়া মেনে নিতেই তো হবে।

জমাদার—বাচ্চাটাকে যদি আর কখনো কষ্ট দিয়েছিস তো জেলে যেতে হবে।

শুকনো খটখটে চোখ আর জিরজিরে চেহারা নিয়ে আস্তে আস্তে চলে গেল নিষ্কর্মা ও নিষ্ঠুর গেঁজেল মথুরা।

পরদিন সকালে শিমুলতলার কুঁড়েঘরের কাছে গেঁজেলের গলার গান আর বেজে উঠলো না। তখন তারকবাবুর বাগানের পেছনে খাটালের কাছে দাঁড়িয়ে আছে মথুরা আর মথুরার ছেলে ভোলা। ভোলাকে নতুন

কাজে, এইবার একটা সত্যিকারের কাজে লাগিয়ে দেবার জন্য এসেছে মথুরা।

এক দুই তিন, এক এক করে পঁচিশটা শ্যামলী ধবলী ও রাঙী শিং দুলিয়ে বের হয়ে আসে খাটাল থেকে। খালের পাশের পথ ধরে দূরের মাঠের দিকে যেতে থাকে গরুর পাল। পেছনে পেছনে আস্তে আস্তে হেঁটে চলে মথুরা আর ভোলা। শীতকাল, ভোলাকে তাই একটা ছেঁড়া পশমের কোট দিয়েছেন তারকবাবু। ভোলার ছোট শরীরের পা পর্যন্ত ঝুলছে ছেঁড়া পশমের কোট। ভোলার হাতে ছোট একটা লাঠিও ধরিয়ে দিয়েছে মথুরা।

মাঠের কাছে এসে একটা গাছের তলায় দাঁড়ায় মথুরা আর ভোলা। ভোলা প্রশ্ন করে—বাবা গো।

—কি রে?

—এখানে কেন এলি বাবা?

—এখানেই তো গরু চরাবি তুই।

ভোলা চেঁচিয়ে ওঠে—তুই যে বললি, আজ আমি ধেনু চরাবো।

মথুরা ধমক দেয়—হ্যাঁ রে হতভাগা।

ভোলা বলে—তবে ধেনু কই?

মথুরা—এই তো।

ভোলা নাকিসুরে কাঁকয়ে আপত্তি করে—এ যে গরু।

মস্ত বড় একটা শিঙেল গরু হাঁসফাঁস করে এগিয়ে এসে একেবারে ভোলার গা ঘেঁসে দাঁড়ায়। এক লাফ দিয়ে সরে মথুরার পেছনে এসে দাঁড়িয়ে ভোলা বলে—বাবা গো।

—কিরে?

—বড় ভয় করছে বাবা।

মথুরা চেঁচিয়ে বলে—ভয় কি রে, মার লাঠি। জোরে জোরে মার।

হাতের লাঠি তুলে গরুর গায়ে জোরে একটা বাড়ি মারে ভোলা। ছুটতে থাকে শিঙেল গরু। পেছনে তাড়া করে দৌড়ে চলে ভোলা। মথুরা চিৎকার করে উৎসাহ দেয়।—মার মার, আরও জোরে মার।

লাঠি হাতে নিয়ে উৎসাহে দুঃসাহসী হয়ে ছুটতে থাকে ভোলা, ছেঁড়া পশমের কোটে ঢাকা একটা বাচ্চা-শরীর। দেখতে অদ্ভুতও লাগে। পলকহীন লাল লাল চোখ তুলে দেখতে থাকে গেঁজেল মথুরা।

হ্যাঁ, সত্যিই কাজে লেগে গিয়েছে ভোলা। ছেলেটা বড় বাধ্য। কোন ফ্যাসাদ ভুগতে হলো না। শিখিপাখা বনমালা আর পীত-ধড়ার জন্য কান্নাকাটি করলো না!

এইবার ঘরে ফিরবে মথুরা। কোমরের গোঁজ থেকে গাঁজার কল্‌কে বের করে।

গাঁজা টিপতে টিপতে মাঠের উড়ন্ত ধুলোর দিকে একবার তাকায় মথুরা। তাই তা! বনমালা নেই, মোহনবাঁশী নেই, তবু কেমন নেচে নেচে ছুটে ছুটে ধেনু চরাচ্ছে রাখালরাজা।

কি আশ্চর্য, নিষ্কর্মা ও নিষ্ঠুর গেঁজেল মথুরার যে চোখ গাঁজার ধোঁয়াতেও কোনদিন ছলছল করেনি, সেই শুকনো খটখটে চোখ দুটোই ছলছল করতে থাকে।

## শাস্তিদাতা

প্রথমে চিৎকার করে উঠলেন মেজবাবু। তারপর সেই প্রকাণ্ড বাড়িটা। তারপর পাড়াটা। এবং তারপরেই যেন সারা গ্রামের প্রাণটাই চেঁচিয়ে উঠলো। সেই চিৎকার অদ্ভুত রকমের একটা ভয়ের শিহরণ আর কাঁপুনি দিয়ে গড়া। সেই সঙ্গে যেন একটা আক্রোশের গর্জনও গো গো করে ফেটে পড়তে চাইছে। আরও মনে হয়, যেন ঘুমন্ত মানুষের একটা শিবিরের উপর হঠাৎ এক শত্রুর আক্রমণ ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। চার দিকে একটা সাজ-সাজ মার-মার শব্দের এলোমেলো দৌড়াদৌড়ি জেগে উঠেছে।

গাঁয়ের পথের অন্ধকারে এদিক থেকে ওদিক, এখানে আর সেখানে, ঝাঁকে ঝাঁকে লণ্ঠন ছুটোছুটি করে। লাঠির আছড়ানির শব্দ শোনা যায়, কুকুরের উচ্ছ্বসিত চিৎকার। এদিকের হাঁক শুনে ওদিকের চিৎকার ছুটে আসে; আবার এদিকের চিৎকার ছুটে ওদিক চলে গিয়ে হাপাতে থাকে। কোথায়, কোন্ দিকে, কার বাড়িতে, কতখানি সর্বনাশ হয়ে গেল? ঘুমভাঙা গ্রামের বাতাস মথিত করে যতগুলি আর যে-সব ধরণের আর্তনাদ, ভয়ের কাঁপুনি, আর দাঁতঘষা আক্রোশের শব্দ জেগে ওঠে, তার মধ্যে শুধু একটি শব্দের ভাষা বুঝতে পারা যায়—চোর চোর চোর! চোর ঢুকেছে এই গ্রামেরই কোন ঘুমন্ত সংসারের সর্বনাশ করবার জন্য।

সারা গ্রামের শেষ রাতের সেই এলোমেলো চিৎকার, লণ্ঠনের আলো আর লাঠির প্রতিজ্ঞাগুলি শেষ পর্যন্ত যেন একটা ছন্দ খুঁজে পায়। সকলেই চারাদক থেকে হন্তদন্ত হয়ে একে একে মেজবাবুর সেই প্রকাণ্ড বাড়ির দিকে ছুটে আসতে থাকে।

চোর ধরা পড়ে গিয়েছে। মেজবাবুর চিৎকার থেমে গিয়েছে অনেকক্ষণ। প্রকাণ্ড বাড়ির চিৎকারও থিতিয়ে এসেছে। উঠানভরা ভিড়ের মাঝখানটা মানুষের মাথায় মাথায় ঘেঁষাঘেষি হয়ে একেবারে নিরেট হয়ে গিয়েছে। ভিড়ের চারদিকে, উঠানের কোণে কোণে এবং বাড়ির দরজায় দরজায় একটু ফাঁকা ফাঁকা ভিড়। মেয়েরা দাঁড়িয়ে তখনো ভয়ার্ত গুঞ্জনের মত গুনগুন করে কথা বলে। ছেলে-মেয়েরা কলরব করে। এরই মধ্যে দুটো লণ্ঠনকে

উঁচু করে থামের গায়ে বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবুও চোরকে সকলে এখনও দেখতে পাচ্ছে না। কারণ, ভিড়ের সেই নিরেট মধ্যিখানের ভিতরে এখনও কিল চড় আর ঘুঁসির আড়ালে চাপা পড়ে আছে চোরটা! চোরের কাতরানির শব্দ একটুও শোনা যায় না। ভয়ঙ্কর কঠিন ও ধূর্ত নাকি সেই চোরের শরীরটা। মার হজম করার মন্ত্র জানে।

সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট করে শোনা যায়, মেজবাবুর ভাগ্নে নিবারণ আর দারোয়ান বাবুলালের হুঙ্কার। এরাই দুজনে মিলে তাড়া করে চোরকে ধরেছে, এবং এখন সেই চোরকে দু'জনের দু'জোড়া হাতের প্রচণ্ড মত্ততার মাঝখানে নিয়ে কি খেলা খেলছে কে জানে।

বারান্দার উপরে চেয়ার পেতে বসে আছেন মেজবাবু। পাশে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বাড়ির মাস্টার মশাই। নিঃশব্দে, অতি শান্ত দুই চক্ষুর তৃপ্তি নিয়ে মেজবাবু এখন চোরের এই শাস্তির অনুষ্ঠানকে মাঝে মাঝে একটি দুটি কথা বলে উৎসাহিত করছেন।

মেজবাবু বলেন—সেদিন তো আর নেই মাস্টার মশাই, নইলে এ রকম সাংঘাতিক চোরকে আমি নিজেই ফিনিশ করে দিতাম। আমার ঠাকুরদার কাছেই গল্প শুনেছি, এ গাঁয়ে চোর ধরা পড়লে তার মুণ্ডু কেটে ইচ্ছামতীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হতো। আমি বলি, অতটা করবার কোন দরকার হয় না। ওতে ঠিক শাস্তিটাও হয় না। তাকেই বলে শাস্তি, যা দিলে এই রকম চোর ভবিষ্যতে আর কখনও চুরি করতে পারবে না।

মাস্টার মশাই বলে—যা মার পড়েছে, তার পর লোকটা আর চুরির সাহস স্বপ্নেও পাবে না।

মেজবাবু বলেন—ভুল বুঝেছ মাস্টার মশাই, এরকম এলোমেলো মার কোন শাস্তিই নয়।

মেজবাবু হাঁক দিলেন নিবারণ! ও বাবুলাল!

চোরের পিঠে আর কোমরে দশ-বার পাক দড়ি জড়িয়ে ততক্ষণে একটা খুঁটোর সঙ্গে চোরকে বেঁধে ফেলেছে নিবারণ আর বাবুলাল।

নিবারণ চেঁচায়—বলুন মামা।

বাবুলাল হাঁপায়—বোলিয়ে হুজুর।

মেজবাবু বলেন—ওতে ওর শাস্তি হবে না। তার চেয়ে বরং……।

মেজবাবু বোধ হয় শাস্তি-তত্ত্বের অন্তর থেকে একটা খাঁটি কাজের মত

কাজের নির্দেশ পেতে চাইছেন। তাঁর শান্ত চোখ দুটো হঠাৎ ক্ষুব্ধ হয়ে কটমট করে। বার বার ভ্রূকুঞ্চিত করেন।

তাঁর পক্ষে ক্ষুব্ধ হবারই কথা। শেষ রাতে ঘুম থেকে উঠে বাইরে আসতেই থমকে দাঁড়িয়েছিলেন মেজবাবু। বুকের ভিতরটা ভয়ানকভাবে চমকে উঠেছিল। একটা ছায়ামূর্তি তাঁরই ঠাকুর ঘরের দরজা থেকে বের হয়ে আস্তে চলে যাচ্ছে।—কে?—কে?—কে? বলতে বলতে ছুটে আসতেই পালিয়ে গেল সেই ছায়ামূর্তি এবং ঝুপ করে কি একটা বস্তুকে উঠানের ওদিকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। মেজবাবু দেখতে পেলেন—তাঁরই ঠাকুরঘরের বিগ্রহ। কষ্টিপাথরের বিষ্ণু, এই মাসেই অনেক ঘটা করে যে বিষ্ণুর মুকুট ষোল ভরি সোনা দিয়ে বাঁধিয়েছেন মেজবাবু। দশটা দিনও পার হয়নি, কত বড় অভিষেক উৎসব হয়ে গিয়েছে এই প্রকাণ্ড বাড়ির ঠাকুরদালানের আঙিনায়।

মেজবাবুর চিৎকার শুনেই ভাগ্নে নিবারণ আর দারোয়ান বাবুলাল চিতাবাঘের মত ছুটে গিয়েছে, এবং দীঘির ওপারে কলাবাগানের ভিতর থেকে চোরকে ধরে নিয়ে এসেছে। শক্ত করে গামছা পড়া, কোমরে বেল্ট বাঁধা, ছোট-খাট চেহারার একটা লোক। মুখটা ইঁদুরের মত। হাত-পাগুলি কি ভয়ানক শক্ত। আতুড় গায়ের মাংসগুলি ছোট ছোট নুড়ির মত শক্ত। ঘুঁসি মারলে কচকচ শব্দ করে।

ক'দিন আগে ভট্চায বাড়ির বড় ঘরে সিঁদ কেটে সিন্দুক থেকে বেছে বেছে সব রুপোর আর তামার বাসনগুলি নিয়ে গিয়েছে, কে সেই চোর? কোন সন্দেহ নেই, এই বেটাই সেই পাকা চোর। হরিশের দুটো বকনা তিনদিন হলো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। হরিশ বলে—এই বেটাই, এ ছাড়া আমার এমন তাজা তাজা দুটো বকনাকে গোয়াল ঘরের ভিতর থেকে নিয়ে যাবে কে?

শাস্তি দিতে হবে এই চোরকে। দু'জন লোক চলে গিয়েছে দফাদারকে খবর দেবার জন্য। দেড় মাইল দূরে এক গাঁয়ে থাকে দফাদার। আসতে ভোর হয়ে যাবে। কিন্তু এলেই বা কি?

মেজবাবু বলেন—পুলিশে দেওয়া হবে ঠিকই। কিন্তু তাতে কি আর শাস্তি দেওয়া হলো? বড়জোর দু'বছর কয়েদ হবে। বেটা সুখে থাকবে লাখ টাকা দামের দালানবাড়ি ঐ জেলের ভিতরে। ফিরে এসে আবার মানুষের সর্বনাশ করবে।

হরিশ বলে—সারা গায়ে বিছুটি ঘষে দিলে ভাল হয়।

বল্লভবাবু বলেন—আগুনের ছ্যাঁক দাও, তাহলে নিজের মুখেই সব কথা স্বীকার করবে। এর আগে কোথায় কোথায় চুরি করেছে, ওর নামটাই বা কি, এসব আমাদের জেনে রাখা দরকার।

নিতাই বলে—কিছু কিছু ছুঁচ ফোটানোও দরকার। কিল-চড় ওর গায়ে একটুও বাজছে না কর্তা।

অমূল্য বলে—নাকে লঙ্কার ধোঁয়া দিলেও কাজ হয়।

মেজবাবু বলেন—না, ওতে কিছু হবে না। শাস্তি চাই।

বাবুলাল চিৎকার করে—বোলিয়ে হুজুর।

ভাগ্নে নিবারণ বুযুৎসু জানে। হাত তুলিয়ে হাঁক দেয়।—কি করতে হবে বলে দিন মামা।

মেজবাবু দাঁত চিবিয়ে বলেন—অন্তত একটা হাত ভেঙ্গে দাও, যেন ভবিষ্যতে আর কখনও···।

মাস্টার মশাই ক্ষীণস্বরে আর্তনাদ করতে গিয়ে ফুঁপিয়ে ওঠে—মেজবাবু!

মেজবাবু ধমক দিয়ে অবহেলাভবে মাস্টার মশাই-এর দিকে তাকান—চুপ কর মাস্টার। নো সেন্টিমেণ্ট।

নিবারণ আর বাবুলাল চোরকে জড়িয়ে ধরে। বাবুলাল চোরের মাথাটা এবং নিবারণ চোরের একটা হাত। চোরের হাতটাকে পিঠের দিকে মুচড়ে দিয়ে ভয়ানক জোরে একটা হ্যাঁচকা টান দেয় নিবারণ। ইঁদুরের মত যেন কিচমিচ করে আস্তে একটা শব্দ করে চোরটা। চোখ বন্ধ করে, শরীরটা কুঁকড়িয়ে মোড়ানো হাতটাকে সোজা করবার চেষ্টা করে।

হরিশ চেঁচিয়ে ওঠে—ভেঙ্গেছে, ও হাত আর নাড়তে হবে না।

মাস্টার মশাই মেজবাবুর কানের কাছে ফিসফিস করে—এটা কি রকমের শাস্তি হলো বুঝলাম না মেজবাবু। লোকটার হাতটাকে নষ্ট করে দিলে ওকে যে শেষে ভিক্ষে করে খেতে হবে।

—হবে। মেজবাবু চোখ কটমট করে হুঙ্কার দেন। চুরি তো আর করতে পারবে না। মানুষের সংসার নিরাপদ হবে।

মাস্টার মশাই বলে—আমার মনে হয়, এটা ঠিক শাস্তি হলো না।

—মিথ্যে তোমার ধারণা, মিথ্যে তোমার সেন্টিমেণ্ট। তোমার যদি

এরকম সৌভাগ্যের বিগ্রহ একটি থাকতো, সোনা দিয়ে বাঁধানো মুকুট অমন সুন্দর একটি কষ্টি পাথরের বিষ্ণু, আর চোর এসে দেবতাকে চুরি করতো, তবে তুমি আর এসব মহত্ব দেখাতে চাইতেনা মাস্টার। চিৎকার করে বলতে বলতে মেজবাবু আবার ক্রুদ্ধস্বরে কপালের রগ ফুলিয়ে হুঙ্কার দেন—আর একটা হাত ভেঙ্গে দাও।

চোরের ঘাড়টা আবার জড়িয়ে ধরে বাবুলাল। যুযুৎসুর নিবারণ আবার চোরের হাত চেপে ধরে। উঠানের জনতা চোখ বড় করে দেখতে থাকে দৃশ্য।

সেই মুহূর্তে আর একটা হ্যাঁচকা টান দিয়েই ফেলতো নিবারণ, কিন্তু হঠাৎ একটা অদ্ভুত আর্তনাদ শিউরে উঠলো এই প্রকাণ্ড বাড়িরই একটি ঘরের ভিতরে।—কি ব্যাপার! সকলেই চোখ ফিরিয়ে দেখবার চেষ্টা করে। কান ফিরিয়ে শোনবার চেষ্টা করে।

ঘরের ভিতর থেকে ছুটে বের হয়ে এলেন যিনি, তাঁকে দেখতে পেয়েই চেঁচিয়ে ওঠে নিবারণ—কি হলো মামীমা?

বাবুলাল চিৎকার করে—বোলিয়ে মাইজী।

যা বলবার ছিল, মেজমামী বললেন। তার পরেই জ্ঞান হারিয়ে মাটির উপর পড়ে গেলেন। উঠানের জনতা আবার চেঁচিয়ে ওঠে। আবার সেই ভয়ের কাঁপুনি, আক্ষেপ, আতঙ্ক, আক্রোশ আর হৈ-হৈ। কিন্তু বড় ভীরু সেই ভয়। বড় করুণ সেই আক্রোশ। বড় কুণ্ঠিত সেই হৈ-হৈ।

মেজমামীর ছোট ছেলেটি যে বিছানার উপর ঘুমিয়ে আছে সেই বিছানাতেই বালিশের পাশে একটি কালো কেউটে বিঁড়ে পাকিয়ে বসে আছে, আর ফণা দোলাচ্ছে। ঘুমন্ত ছেলেটি যদি একটি বার হাত নাড়ে, তবে সেই মুহূর্তে এক ছোবলে সেই ছেলের প্রাণের উপর বিষ ঢেলে দেবে ওই ভয়ঙ্কর জীব। কে জানে কখন ঘরের ভিতর ঢুকল মৃত্যুর দূত এই কালো গরলের ভয়াল প্রাণীটি।

ঘরের দরজার কাছে এসে বিশ জোড়া হাত এবং বিশটি লাঠি হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়। আর এগিয়ে যাওয়া যায় না। লাঠি মারা যায় না। সাপটা ঠিক ছেলেটার প্রায় মাথা ঘেঁষে রয়েছে। একটু শব্দ করাও যায় না। হিতে বিপরীত হতে পারে। ঐ কালো গরলের জীবকে মার দিলে, মরতে মরতেই ঐ ঘুমন্ত শিশুটাকে একটি নিষ্ঠুর দংশনে মেরে রেখে দিয়ে যাবে।

প্রকাণ্ড বাড়ির প্রাণ হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়। সব আক্রোশ আর চিৎকার ভীরু হয়ে নীরব হয়ে যায়। মেজবাবুর চোখ দুটো যেন অসাড় হয়ে গিয়েছে। ফ্যাল ফ্যাল করে লণ্ঠনের ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে থাকেন। তাঁর বুকের ভিতর ঢিপ-ঢিপ শব্দও বোধ হয় নীরব হয়ে যাবে।

কি আশ্চর্য, এই নীরবতার মধ্যে প্রথম কথা বলে উঠলো সেই চোরটা। খুঁটোর সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা পিঠ বুক আর কোমর, ইঁদুরের মত মুখ সেই চোরের চোখ দুটো যেন বেজির চোখের মত জ্বলছে। চোর বলে—আমি সাপ ধরতে জানি।

নিবারণ বলে—অ্যাঁ।

চোর বলে—হ্যাঁ গো মশাই, কত সাপ ধরলুম, কত সাপ খেলালুম। আমি বিষহরির মন্তোর জানি।

উঠানের জনতা ফিসফাস করে—লোকটাকে কাজে লাগিয়ে নাও নিবারণ।

বল্লভবাবু বলেন—ওকে একটা চান্স দাও নিবারণ। যদি সাপটাকে সরিয়ে দিতে পারে, তবে ওকে ছেড়ে দেওয়াই হবে।

নিবারণ বলে—তা তো বটেই।

চোরের বাঁধন খুলে ফেলা হলো। কিন্তু চোর ওঠে না। একটা হাত আর এক হাত দিয়ে চেপে চোর আবার কাতরাতে থাকে।—বড্ড লেগেছে বাবু, হাড়গুলো চুর চুর হয়ে গিয়েছে। নাড়বো কেমন করে এই হাত?

—পারবি, পারবি। নিবারণ সমীহ করে বলতে থাকে। বল্লভবাবু এগিয়ে এসে চোরের হাত জল দিয়ে মালিশ করতে থাকেন। অমূল্য চেঁচিয়ে ওঠে।—বাস্ ঠিক হয়ে গিয়ে

নিবারণ বলে—এইবার ওঠ্, একটু তাড়াতাড়ি কর বাপু।

চোর বলে—বড় তেষ্টা পেয়েছে বাবু।

তখুনি জল আনা হয়। একঘটি জল ঢক ঢক করে খেয়ে চোর আস্তে আস্তে হাঁপ ছাড়ে। এদিক ওদিক তাকায়। তার পরেই বলে—এক মুঠো সরষে চাই যে বাবু।

ছেলের দল ঘরের ভিতরে ছুটে গিয়ে এক ডালা সরষে নিয়ে আসে। তবু চোরের উৎসাহটা তেমন করে জেগে ওঠে না। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়। এদিক-ওদিক তাকায়। নিবারণ হাঁকে—চল্ চল্ চল্।

চোর বলে—ডান হাতটাকেই যে ঘায়েল করে দিয়েছেন মশাই। বাঁ হাতের জোরে কি অমন কালো কেউটেকে বাগিয়ে ধরা যায়?

নিবারণ বলে—পারবি, নিশ্চয়ই পারবি। বকশিস দেওয়া হবে তোকে। ভাল বকশিস। নতুন কাপড় পাবি। পুলিশে দেওয়া তো হবেই না, ওঠ ওঠ।

শেষ রাতের অন্ধকার অনেকক্ষণ আগেই ফিকে হয়ে গিয়েছিল। এইবার ফর্সা হয়ে আসছে গাঁয়ের পূবের আকাশ। বাড়ির দোতলার ঘরের ভিতর মেয়েদের কান্না শুরু হয়ে গেছে। মেজমামীর মূর্চ্ছা ভাঙেনি। মেজবাবু কাঠ হয়ে বসে আছেন।

নিবারণের হাত ধরে এক-পা দু-পা করে ঘরের দিকে যেতে থাকে চোর। তার পরেই নিবারণের হাত ছেড়ে দিয়ে ধপ করে মাটির উপর দম ধুঁকতে থাকে। বড় বেশী দেরী করিয়ে দিচ্ছে চোরটা। আবার এক ঘটি জল খেতে চায়। জল আনবার জন্য ছুটাছুটি করে উঠানের লোক।

হঠাৎ সারা বাড়ির প্রাণটা যেন উল্লসিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠে। আনন্দের চিৎকার। ঘরের ভিতর ভিড়ের সেই ভয়ার্ত গভীরতা যেন হঠাৎ দূর হয়ে গিয়েছে। কি ব্যাপার? চোরের হাত ছেড়ে দিয়ে ঘরের ভিতরে চলে যায় নিবারণ আর বাবুলাল।

চলে গিয়েছে সাপ। ঘর ছেড়ে সাপটা জানালা বেয়ে একেবারে বাইরে চলে গিয়েছে। এখন দেখা যায়, দরের একটা নারকেলের গা ঘেঁষে ঘেঁষে সাপটা শুকনো পাতার উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে দশ জোড়া চোখ সেই দৃশ্য দেখছে। হরিশ চেঁচিয়ে ওঠে, জয় বিষহরি। জয় মা মনসা।

চেয়ার ছেড়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন মেজবাবু। ছোট ছেলেটাকে তুলে নিয়ে এসে মেজবাবুর কোলের উপর বসিয়ে দিল বাবুলাল।

কিন্তু কই সেই চোর? সেই ইঁদুর-মুখো ভয়ানক জীবটা?

চোর নেই। এই ফাঁকে পালিয়ে গিয়েছে চোর। বাবুলাল চেঁচিয়ে ওঠে—বিলকুল বিলকুল মিথ্যা। সাপ ধরার মন্তোর টন্তোর কিছু জানে না চোর। আপনি ভুল করে চোরের দড়ি খুলিয়ে দিয়েছেন নিবারণ দাদা।

অমূল্য বলে—ঠিক কথা। কি ভয়ঙ্কর ভাঁওতা। আপনিও ওকে বিশ্বাস করলেন নিবারণদা?

বল্লভবাবু বলেন—এতগুলি লোককে কলা দেখিয়ে পালিয়ে গেল চোরটা। ছিঃ।

চেঁচিয়ে ওঠে নিবারণ—ঐ যে, পালাবে কোথায়?

নিবারণ আর বাবুলালের চোখ চিতাবাঘের চোখের মত দপ্ করে জ্বলে ওঠে। স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, কলাবাগানের পাশ দিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে পাটক্ষেতের উপর নেমে পরছে চোরটা।

লাঠি হাতে তুলে নিয়ে নিবারণ আর বাবুলাল একটা লাফ দিতেই মেজবাবু বললেন—থাম থাম।

নিবারণ অপ্রস্তুত হয়ে বলে—আজ্ঞে?

মেজবাবু- ওকে ধরে এনে আর লাভ কি?

নিবারণ—কি আশ্চর্য, মিথ্যে কথা বলে ভাঁওতা দিয়ে চোবটা যে দিব্যি কেটে পড়ছে মামা! ওর আর একটা হাত যে ভেঙ্গে দিতে হবে।

মেজবাবু—না না। বোধ হয় মিথ্যে কথা নয়।

বাবুলাল বলে—মিথ্যে কথাই বলেছে হুজুর। ও বেটা সাপ ধরতে জানে না।

মেজবাবু বলেন—হলোই বা মিথ্যে কথা।

## সম্পত্তি

নরেশ দত্তের বাড়ির সামনে একটা ভীড়। কাগজপত্রের একটা ফাইল হাতে নিয়ে এক ভদ্রলোক এই ভীড়ের মধ্যেই ছটফট করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ইনিই হলেন হাটখোলার মহাজন কৈলাসবাবু। ক্রোকী পরোয়ানা নিয়ে আদালতের লোকের সঙ্গে নরেশ দত্তের বাড়ি দখল করতে এসেছেন।

তবু এক বিন্দু আনন্দ নেই মহাজন কৈলাসবাবুর মনে। পুরো পাঁচটি হাজার টাকা হাতছাড়া হয়েছে নরেশ দত্ত। অথচ ঐ বাড়ি নিলাম করলে বাজার দর অনুযায়ী বাড়ির দাম চড়বে বড় জোর আট হাজার টাকা, তার বেশি কখনই নয়! কিন্তু বৃথা, কোন লাভই হবে না। জোচ্চোর লোকটা আরও তিন মহাজনের কাছে টাকা ধার নিয়েছে। চন্দননগরের এক মহাজনের কাছ থেকে তিন হাজার, বারাসাতের এক মুদীর কাছ থেকে তিন হাজার আর বড়বাজারের এক মাড়োয়ারীর কাছ থেকে তিন হাজার। সব পাওনাদারই এক একটি মামলা এনে নরেশ দত্তের কাছে টাকা দাবী করেছে। শেষ পর্যন্ত ফল এই হল যে, কোন মহাজনই তাঁর প্রাপ্য পুরো টাকা উদ্ধার করতে পারবেন না। নিলামে যে দাম উঠবে ঐ বিশ্রী চেহারার একটা বাড়ির, তাই সকলকে ভাগ করে নিতে হবে। পাঁচ হাজার টাকা পাওনার বদলে কৈলাসবাবুর কপালে দু' হাজারও জুটবে কিনা সন্দেহ। কি ধূর্ত এই নরেশ দত্ত! ওর ট্যারা চোখের দিকে তাকিয়ে কখনো কল্পনাও করা যায় নি যে, এত কৌশল আছে ওর মাথার ঘিলুর ভিতরে। চার চারজন পাকা কারবারী মানুষকে ঐ একটুখানি এক বিশ্রী বাড়ির লোভ দেখিয়ে বন্ধকী হাওলাত করে কতগুলি টাকা হাতছাড়া নিল।

শুধু কৈলাসবাবুই নয়; আরও তিন পাওনাদারের উকীল আর এটর্ণির লোকও ছিল। ছিল আদালতের কেরাণী আর চারজন পুলিশ কনেষ্টবল। ছটফট করছে সকলেই। কারও চক্ষে একবিন্দু সমবেদনার ছায়া নেই। থাকবার কথাও নয়। বরং, যেন একটা প্রতিশোধ নেবার আগ্রহই ছটফট করছে সকলের চোখে।

প্রতিশোধ নেওয়া শুরুও হয়ে গিয়েছে। চারজন কুলি নরেশ দত্তের

ঘরের ভিতর থেকে এক এক করে যত অস্থাবর সম্পদ ঘাড়ে করে তুলে নিয়ে এসে পথের উপর আছাড় দিয়ে ফেলছে। কিন্তু সেই সব অস্থাবর সম্পদের দিকে তাকিয়ে মহাজন কৈলাসবাবুর দু' চোখের আক্রোশ আরও হতাশ হয়ে জ্বলতে থাকে। সব সরিয়ে ফেলেছে জোচ্চোর লোকটা! কুলিরা হাঁপাতে হাঁপাতে ঘাড়ের উপর যেন এক একটা বিদ্রূপের আবর্জনা তুলে নিয়ে আসছে। কয়েকটা কাঠের আলনা, নড়বড়ে তক্তপোষ, দুটো টিনের ড্রাম—তা'ও আবার ফুটো, দশ বারটা পুরনো ল্যাম্পের কঙ্কাল, ছেঁড়া জুতো দু'বস্তা আর পাঁচটা পায়া-ভাঙা চেয়ার। ছি-ছি-ছি, এই আবর্জনা কি দশ টাকা দিয়েও কেউ কিনবে? হাতের ফাইলটা তুলে নিজের কপালের উপরেই আস্তে একটা আঘাত করেন কৈলাসবাবু।

বাড়ির ভিতরে ঢুকে কৈলাসবাবু আর আদালতের কেরাণী স্বচক্ষে দেখে এসেছেন; বিছানার উপর বসে তখনো সেই ধূর্ত লোকটা ট্যারা চোখ তুলে বসে বসে হাসছে। তাই আরও ক্রুদ্ধ হয়ে ছটফট করেন কৈলাসবাবু। লোকটা যে আর একটু পরেই দুনিয়াকে কলা দেখিয়ে হাসতে হাসতে চলে যাবে! একেবারে চোখের উপর দিয়েই সরে পড়বে। একটুও দুঃখিত নয়, একটুও বিমর্ষ নয় লোকটা। বের হয়ে যাবার জন্য যে লোকটা মনের আনন্দে তৈরী হয়েই রয়েছে, তাকে বের করে দিয়ে কোন প্রতিশোধের আনন্দও নেই। লোকটা এমনই একটা চতুর ভাঁওতা যে, ওকে জব্দ করার সুযোগ নেই আর শক্তিও নেই এই পৃথিবীর।

নরেশ দত্তের বাড়ি। মাত্র চারখানা ছোট ছোট ঘর, একটুখানি একটা উঠান, সরু সরু বারান্দা, দরজা ও জানলার কাঠ কুঁকড়ে গিয়েছে। দেয়ালের এখানে ওখানে পালেস্তারার তলায় উই। বাড়িটার বয়স চল্লিশ বছরের কম নয়, নরেশ দত্তের চেয়ে মাত্র দশ বছরের ছোট। নরেশ দত্তের বাপ এই বাড়ি তৈরী করার পর দশটি বছর মাত্র বেঁচে ছিলেন। নরেশ দত্তের বিয়ে হবার বছরেই মারা গেলেন নরেশ দত্তের বাপ। তারপরেও চারটি বছর এই বাড়িটার মধ্যে কলরব ছিল, কিন্তু তারপর আর নয়। তারপর থেকেই বাড়িটা যেন কেমন হয়ে গেল। ধীরে ধীরে ঘুন ধরলো কড়িকাঠে, আর দেয়ালে উই।

কিন্তু যেদিন, আজ থেকে প্রায় পঁচিশ বছর আগে এই বাড়িটা যেদিন শেষবারের মতো শব্দ করে কেঁদেছিল, সেদিন সান্ত্বনা দেবার জন্য এই বাড়ির

ভিতরে এসেছিলেন প্রতিবেশী বিনোদবাবু। ঐ যে, উই-খাওয়া বাড়িটার সামনে প্রকাণ্ড লালরঙের দালান বাড়িটা হলো বিনোদবাবুর বাড়ি। বিনোদবাবুও এখন তাঁর দালান বাড়ির বারান্দায় কয়েকজন প্রতিবেশী ভদ্রলোকের সঙ্গে বসে গল্প করছেন, আর দেখছেন নরেশ দত্তের বাড়ি ক্রোক করার হল্লা ছটফটানি উল্লাস আর আক্রোশের দৃশ্যটাকে। কোন সমবেদনা নেই বিনোদবাবুর চোখে, কোন প্রতিবেশী ভদ্রলোকের চোখে। কারণ, সকলেই জানেন যে, বোগাস নরেশ দত্তই এতগুলি মহাজনকে কলা দেখিয়ে সরে পড়ছে। ইচ্ছে করেই আর রীতিমত প্ল্যান করে লোকটা ভাঁওতা হাসিল করেছে। যা চেয়েছিল নরেশ দত্ত, তাই হয়েছে।

নরেশ দত্তের ঐ বাড়ি, ত্রিশ বছর আগে ঐ বাড়ির দেয়ালে উই লাগেনি। নরেশ দত্তের বউভাতের নিমন্ত্রণ খেয়েছিলেন বিনোদবাবু ঐ বাড়িরই ছাদের উপর বসে। তারপর একদিন নরেশ দত্তের ছেলের অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণও খেয়েছিলেন বিনোদবাবু ঐ বাড়ির উঠানে ছোট এক রঙীন সামিয়ানার নীচে বসে। কি যেন নাম ছিল ছেলেটার? বিশু, হ্যাঁ বিশু। বিশুর মা বিশুকে কোলে নিয়ে ঐ বাড়িরই ছাদের উপর দাঁড়িয়ে প্রায় রোজই সন্ধ্যাবেলা কথা বলতো পাশের বাড়ির শ্যামবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে।

কিন্তু বাস, তারপর আর নয়। নরেশ দত্তের ঐ বাড়ি আর কোনদিন হেসে হেসে নিমন্ত্রণ করতে পারেনি প্রতিবেশী বিনোদবাবুকে।

দু'টি বছর যেতে না যেতেই বার বার তিনবার কেঁদে উঠল নরেশ দত্তের বাড়ি। প্রত্যেকবার ছুটে এলেন বিনোদবাবু। প্রথমবার, নরেশ দত্তের বাবা মারা গেল যেদিন। দ্বিতীয়বার, নরেশ দত্তের স্ত্রী মারা গেল যেদিন। আর তৃতীয়বার, নরেশ দত্তের ঐ বাড়ির কান্না শুনে ছুটে সেদিন এসেছিলেন বিনোদবাবু আর প্রতিবেশীরা, একমাসের জ্বরে মারা গেল যেদিন তিন বছর বয়সের বিশু।

হ্যাঁ, আর একবার এসেছিলেন বিনোদবাবু। সেই রাত্রেই। সেই শেষ আসা। শোকার্ত আর সারাদিন উপোসী নরেশ দত্তকে সান্ত্বনা দিয়ে কিছু খেতে রাজি করাবার জন্য এসেছিলেন বিনোদবাবু। এসেই দেখতে পেয়েছিলেন, ঘরের ভিতর দেয়ালের গায়ে ছোট একটা কালো ছাপের দিকে ট্যারা চোখের অপলক দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে আছে নরেশ দত্ত। শিশুর কালিমাখা ছোট্ট হাতের একটা ছোট্ট ছাপ।

ছলছল করে উঠেছিল নরেশ দত্তের ট্যারা চোখের দৃষ্টি। বলেছিল নরেশ দত্ত, বিশ্বাস করুন বিনোদদা, এই বাড়িটাই অপয়া, ভয়ঙ্কর অপয়া।

সেদিন নরেশ দত্তের ট্যারা চোখের ছলছল দৃষ্টিকে বিশ্বাসই করেছিলেন বিনোদবাবু। কিন্তু তারপর? তারপর নরেশ দত্ত নিজেই বুঝিয়ে দিয়েছে যে, ঐ ট্যারা চোখ শুধু ধূর্ত হাসি লুকিয়ে লোক ঠকাবার ফিকিরে ঘুরে বেড়ায়। অপয়া বাড়িটাকেই পয়া করে তুলেছে নরেশ। আট হাজারও দাম হবে না যে বাড়ি, সেই বাড়িকে ভাঙিয়ে পনর হাজার টাকা বাগিয়েছে।

এই সেদিনও, যেদিন নরেশ দত্তের বিরুদ্ধে মহাজনের মামলা সুরু হলো, সেইদিন বিনোদবাবুর কাছেই এসে বেপরোয়া বেহায়ার মতো হেসে হেসে নরেশ দত্ত বলেছিল, বুঝলাই ওরা মামলা করছে বিনোদদা।

—কেন? আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন বিনোদবাবু।

নরেশ দত্ত বলেছিল, আমার কোনই লস হবে না বিনোদদা। কাঁচা ইঁটের বাড়ি, বাজে শাল কাঠের কড়ি বরগা আর চৌকাঠ। তাতে আবার ঘুন ধরেছে। এ বাড়ি ছেড়ে দেবার চেষ্টাই করে আসছি পঁচিশ বছর ধরে।

বিনোদবাবু—কিন্তু কোথাও মাথা গুঁজে থাকতে হবে তো।

ঝক করে হেসে ওঠে নরেশ দত্তের ট্যারা চোখ—তা চেষ্টা করলে কি একটা জায়গা হবে না বিনোদদা।

বিনোদবাবু—নতুন বাড়ি করবার মতলব করেছেন না কি?

মুখের কথার উত্তর না দিয়ে শুধু হাসতে থাকে নরেশ দত্ত। তারপর বলে—টাকা হাতে থাকলে কি না হয়?

পঁচিশ বছর আগে এই নরেশ দত্তকে পাড়ার লোকেরা ঠিক চিনতে পারেনি, চিনেছে অনেক পরে, এবং আজ সবচেয়ে ভাল করে চেনা গেল। ঠিকই বলে পাড়ার ছেলেরা, বোগাস নরেশ দত্ত। শুধু কথার চালাকিতে মানুষকে বোকা ক'রে দিয়ে লোকটা অনেক ক্লাব সমিতি আর সেবাকার্যের টাকা মেরেছে। ভুয়ো কোম্পানী করার অভিযোগে দু'বার মামলায় পড়েছিল। ওর মুখের কথা আর হাতের সইকে আজ অন্তত এই পাড়ার কোন মানুষ বিশ্বাস করে না।

নরেশ দত্তের বাড়ির সামনে ভীড়ের হল্লা বাড়ে। দৌড়াদৌড়ি করে পুলিশ কনেষ্টবল। সেই দিকে তাকিয়ে বিনোদবাবু বলেন—প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়স হলো লোকটার, তবু কি আশ্চর্য।

তবু, কি আশ্চর্য, লোকটা মানুষকে ধাপ্পা দেবার ব্যবসা করে দিব্যি দিন কাটিয়ে দিচ্ছে আর টাকা জমাচ্ছে। মাত্র একটা প্রাণ, টাকার জন্য এত লোভের দরকারই বা কি ?

কিন্তু চিন্ময়বাবু বলেন—ভালই হলো, লোকটাকে পাড়া থেকে সরাবার অনেক চেষ্টা করেছিলাম, পুলিশকেও অনেকবার বলেছিলাম। কিন্তু কোনই ফল হয়নি। আজ যাই হোক··।

আজ দেখা যাচ্ছে, লোকটা সত্যিই চলে যাচ্ছে। পাড়ার মধ্যে এরকম একটা সাংঘাতিক বোগাস লোক থাকলে পাড়ার পক্ষেই আশঙ্কার কথা।

আক্ষেপ শুধু এই যে, লোকটা একটুও জব্দ হলো না। বেশ মোটারকম বাগিয়ে নিয়ে, আর খুশি মনে একটা উই-খাওয়া আর ঘুনধরা অপয়া বাড়িকে পাড়ার বুকের উপর ফেলে দিয়ে সরে পড়বে বোগাস নরেশ দত্ত। শুধু হাটখোলার মহাজন কৈলাসবাবু নয়, বিনোদবাবু, চিন্ময়বাবু, আর প্রতিবেশীদের ভীড়টাও একটা চাপা আক্রোশ নিয়ে নরেশ দত্তের বাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকে।

কিন্তু লোকটা এখনো বাড়ির ভিতর বসে করছে কি ? বোধহয় ট্যারা চোখ নিয়ে হাসছে আর সিগারেট খাচ্ছে।

হঠাৎ একটা সোরগোল জাগে বাড়ির সামনে পথের ভীড়ের মধ্যে। কি হয়েছে ? কি হয়েছে ? প্রশ্ন করে সকলেই।

পুলিশ কনেষ্টবল বলে—বাড়ির বের হতে চাইছে না লোকটা।

গর্জন করেন হাটখোলার মহাজন, আর সেই গর্জনে এতক্ষণের একটা হতাশ আক্রোশ উল্লাস হয়ে ফেটে পড়ে।—গলা টিপে, কান ছিঁড়ে, ঘাড়ে ধরে, লাথি মেরে বের করে দিন বেটাকে। হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে আসুন ঠগটাকে।

আদালতের কেরাণী পুলিশ কনেষ্টবলকে লক্ষ্য ক'রে বলেন—দেখবেন মশাই, একটু সামলে কাজ করবেন। মনে হচ্ছে, লোকটার কোন অসুখ বিসুখ করেছে।

কনেষ্টবল বলে—আমার মনে হয় লোকটার মাথা খারপ হয়েছে। বিছানাটা গুটিয়ে বগলদাবা করে নিয়ে চুপ করে মেজের ওপর বসে রয়েছে। কিন্তু, উঠতে চাইছে না।

আদালতের কেরাণী বলেন—তাহলে বোঝা যাচ্ছে, অসুখও হয়েছে,

মাথাও খারাপ হয়েছে। কাজেই, এ অবস্থায় লোকটার গায়ে হাত দেওয়া ঠিক আইন মত কাজ হবে কি ?

হাটখোলার মহাজন কৈলাসবাবু দুটো দশ টাকার নোট বের করে আদালতের কেরাণী আর পুলিশ কনেষ্টবলের হাতের কাছে এগিয়ে দিয়ে চাপা স্বরে ফিসফিস করে বলেন—আর জ্বালা বাড়াবেন না মশাই। এইবার খুশি হয়ে কাজটা সেরে দিন। লোকটাকে ঘারে ধরে...।

বাড়ির ভিতরের দিকে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে গেল কনেষ্টবলের মারমূর্ত্তি। চেঁচাতে থাকেন কৈলাসবাবু—কান ধরে হিড়হিড় করে, একেবারে হেঁচড়ে ঘেঁষড়ে টেনে···।

কিন্তু বৃথাই প্রতীক্ষায় ছটফট করেন মহাজন কৈলাসবাবু আর পথের ভীড়। কনেষ্টবল ভিতরে গিয়েছে তো গিয়েছেই, ফিরে আর আসে না।

গর্জন করেন আদালতের কেরাণীবাবু—এঃ, এত সমীহ করার কি আছে ? হাত ধরে টেনে আনলেই তো···।

বলতে বলতে কেরাণীবাবু তাঁর হাতের ক্রোকী পরোয়ানা বুকে চেপে নিয়ে বোগাস নরেশ দত্তের উঁই-খাওয়া বাড়ির ভিতর লক্ষ্য করে ছুটে যান

কিন্তু বৃথা, কেরাণীবাবু ফিরে আসেন না। পুরো দশটা মিনিট সময় পার হয়ে যায়। অস্থির হয়ে আতঙ্কিত ভাবে ডাক ছাড়েন কৈলাসবাবু—কি হলো মশাই ?

পথের ভীড়ও কৌতূহল সহ্য করতে না পেরে মুখর ও চঞ্চল হয়ে ওঠে—কি হলো ? কি হলো ? আবার কি কাণ্ড হলো ?

সামনের বাড়ির বারান্দায় বিনোদবাবু আর চিন্ময়বাবু চেঁচিয়ে ওঠেন—কি হলো ?

কৈলাসবাবু বলেন—লোকটা আবার ভোগা দিচ্ছে মশাই, বের হতে চাইছে না।

বিনোদবাবু বলেন—আর দেরি করবেন না। নইলে আবার একটা ফ্যাসাদ বাধিয়ে তুলবে।

ভীড়ের মধ্যে কে একজন চেঁচিয়ে ওঠে—বাঁধিয়ে তুলছে বোধ হয়।

কৈলাসবাবু দাঁতে দাঁত চেপে হুঙ্কার ছাড়েন—তাহলে ?

বলতে বলতে স্বয়ং কৈলাসবাবু আর পথের সমস্ত ভীড় হুড়মুড় করে বোগাস নরেশ দত্তের ঘুনধরা বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়ে।

এতক্ষণে সব চাঞ্চল্য আর মুখরতাকে যেন হঠাৎ গিলে ফেলেছে অপয়া বাড়িটা। একেবারে স্তব্ধ, কোন শব্দ হয় না! বাড়ির ভিতরে ঢুকে এত বড় একটা কলরবও কি মরে গেল?

বিনোদবাবু উঠে দাঁড়ান। ব্যাপার কি? লোকটা বের হয় না কেন?

চিন্ময়বাবু এক দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকেন।—লোকটাকে বের করে দেওয়া হচ্ছে না কেন? এত দেরী কিসের জন্য?

বিনোদবাবু—বোধ হয় আবার একটা ব্লাফ দিয়ে সকলকে বোকা বানাচ্ছে বোগাসটা।

চিন্ময়বাবুর দুই চোখ কটমট করে ওঠে।—তাহলে আমাদের কর্ত্তব্য হলো…।

যেন পাড়ার মধ্যে এক ঝোপের ভিতর ক্ষেপা শেয়াল লুকিয়ে রয়েছে। বের হতে চায় না, কি বের করে দিতে হবে। ধমক না শুনলে ঘাড়ে হাত দিতেই হবে। দিতে দেরী হচ্ছে কেন? কি এমন সমস্যা?

চিন্ময়বাবু বলেন—আপনি একটি ধমক দিলে কাজ হবে বিনোদবাবু।

আর দেরী করলেন না বিনোদবাবু আর চিন্ময়বাবু! ব্যস্তভাবে হেঁটে এসে ঘুনধরা বাড়িটার ভিতরে ঢুকলেন।

সত্যিই কি ভয়ানক ব্লাফ জমিয়েছে বোগাস নরেশ দত্ত।

এতগুলি লোকের ভিড় যেন হতভম্ব হয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে দেখছে নরেশ দত্তের ট্যারা চোখ দু'টোকে, আর মাঝে মাঝে আর একটি জিনিষকে।

পুলিশ কনেষ্টবলের হাত দুটো যেন অকর্ম্মণ্য পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে রয়েছে, একটুও নড়ে না। বোগাস নরেশ দত্তের ঘাড় স্পর্শ করবার সাহস নেই কনেষ্টবলের ঐ দুই হাতে।

আদালতের কেরাণী ক্রোকী পরোয়ানাকে মিছামিছি পড়েন আর এদিক ওদিক তাকান।

হাটখোলার মহাজন কৈলাসবাবু আস্তে আস্তে মাথা চুলকান, আর এক পাশে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবার চেষ্টা করেন।

আর, ভীড়ের লোক অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে, যেন বোগাস নরেশ দত্তকে নতুন ক'রে চেনবার চেষ্টা করছেন বিশ জোড়া চক্ষু।

ময়লা উইধরা দেয়ালের গায়ে ছোট একটি শিশুর হাতের একটি কালি-

মাথা ছাপ। গোটানো বিছানা বগলদাবা করে বসে আছে বোগাস নরেশ দত্ত, আর তার ট্যারা চোখের দৃষ্টি নিষ্পলক হয়ে রয়েছে সেই কালিমাখা ছাপের দিকে তাকিয়ে। যেন হঠাৎ কোমর ভেঙ্গে বসে পড়েছে নরেশ দত্ত আর উঠতেই পারছে না। অচল অনড় আর স্তব্ধ ক'রে দিয়েছে নরেশ দত্তকে, ঐ কোন এক শিশুর হাতের ছোট্ট একটি কালিমাখা ছাপ।

বিনোদবাবু চমকে ওঠেন। চিন্ময়বাবু ভয় পেয়ে বিনোদবাবুর কানের কাছে ফিসফিস করেন।—ঐ যে সেই, সেই যে আপনি গল্পটা বলেছিলেন, মনে পড়েছে বোধ হয়, ঐ ছাপটা বোধ হয় ওরই···।

বিনোদবাবু—হ্যাঁ, ওরই ছেলের হাতের ছাপ।

বোগাস নরেশ দত্তের ভয়ঙ্কর ব্লাফ সত্যিই একেবারে অকর্ম্মণ্য করে দিয়েছে আদালতের ক্রোকী পরোয়ানা আর এতগুলি আক্রোশ আক্ষেপ আর প্রতিশোধের দাবীগুলিকে।

ঠিকই, উঠতে পারছে না বোগাস নরেশ দত্ত। যেন আজ পঁচিশ বছর পরে নিজেকেই হঠাৎ চিনতে পেরে ভয় পেয়েছে নরেশ দত্ত, আর ধপ ক'রে বসে পড়েছে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এতগুলি সুবিচার আর প্রতিশোধের মূর্ত্তিগুলিকেও যেন বসিয়ে দিয়েছে নরেশ দত্ত। মহাজন কৈলাশবাবু অসহায়ের মত ভাঙ্গাগলায় আস্তে আস্তে বলেন—এখন আপনিই একটা পরামর্শ দিন বিনোদবাবু।

কথা বলেন বিনোদবাবু—তুমি যদি ইচ্ছে করো তবে এখনো এখানেই থাকতে পার নরেশ, কিন্তু মহাজনদের টাকা ফিরিয়ে দিতে হবে।

কোন উত্তর দেয় না নরেশ দত্ত।

বিনোদবাবু—এই বাড়ির জন্য যদি এতই মায়া ছিল, তবে কেন মিছিমিছি ।

উত্তর দেয় না নরেশ দত্ত।

বিনোদবাবু—যদি কথা দাও যে, একমাসের মধ্যে সকলের পাওনা মিটিয়ে দেবে, তাহলে···।

চিন্ময়বাবু বলেন—তাহলে এঁরাও ক্রোক স্থগিত রাখবেন, আর তুমিও আপাতত এখানে থাকতে পারবে নরেশ।

গোটানো বিছানাটা আস্তে আস্তে খুলে ঘরের দেয়াল ঘেঁষে পেতে ফেলে নরেশ দত্ত। বিছানার উপর বসে, আর দেয়ালের কালিমাখা ছোট্ট

হাতের ছাপের দিকে ট্যারা চোখের অদ্ভুত এক স্নেহান্ধ দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকে। যেন দু'চোখের সাধ ঢেলে দিয়ে জীবনের একটা খাঁটি সম্পত্তির রূপ দেখছে নরেশ দত্ত।

বিনোদবাবু বলেন—তাহ'লে কি বলছ নরেশ?

আনমনার মত বিড় বিড় ক'রে নরেশ দত্ত বলে--পরের কথা পরে। এখন আমি এক পা'ও নড়তে পারবো না বিনোদদা।

আর্তস্বরে চেঁচিয়ে ওঠেন মহাজন কৈলাসবাবু—তাহলে আমার কি হবে? একটা পরামর্শ দিন আপনারা।

ঘরের ভিতরে ভিড় কোন উত্তর না দিয়ে চুপচাপ আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে বের হয়ে যায়।

বোধ হয় আধ মিনিটও পার হয়নি, মহাজন কৈলাশবাবুও যেন প্রচণ্ড একটা ভয়ের তাড়া খেয়ে ঘরের ভিতর থেকে ছুটে বের হয়ে এসে বাইরের ভিড়ের কাছে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে থাকেন।

আদালতের কেরাণী প্রশ্ন করেন--কি হলো?

কৈলাসবাবু বলেন—উঃ, কি ভয়ানক জিনিষ।

কেরাণীবাবু হাসেন—কার কথা বলছেন? রোগাস নরেশ দত্ত।

কৈলাসবাবু--আরে নারে মশাই, দেওয়ালের গায়ে ঐ যে একটা । যাক্‌গে, এইবার একটা পরামর্শ দিন।

কেরাণীবাবু চিন্তিত ভাবে বলেন—আপাততঃ ।

## গানের চেয়ে বেশী

বেহালার নতুন রাস্তার ধারে পাশাপাশি তিনটি নতুন বাড়ী। এদিকের বাড়ীটা হ'ল মুক্তাকণা মিত্রের বাবা সঞ্জয় মিত্রের বাড়ী। আর ওদিকের বাড়ীটা হ'ল বিদুলা সেনের কাকা পার্থ সেনের বাড়ী। মাঝের বাড়ীটা ভাড়া খাটে; বাড়ীর মালিক দাশগুপ্ত মশাই থাকেন নিউ শ্যামবাজারে।

মাঝের বাড়ীটা বেশ কিছুদিন খালি থাকার পর, সেই বাড়ীতে ভাড়াটিয়া হয়ে যারা এসেছে, তারা হল এক পরিবার। এসেছেন এক অপ্রবীণ বয়সের ভদ্রলোক, তার মা আর তার দুটি ভাই-বোন। দেখে বোঝাই যায়, এখনও বিয়ে করেন নি ভদ্রলোক। আরও বোঝা যায় বছর দশেক আগে বিয়ে করলেই ভাল করতেন ভদ্রলোক। চেহারাটা তেমন কিছু কাঁচা-বয়সের চেহারা নয়।

সঞ্জয় মিত্র আর পার্থ সেন কিন্তু ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রথম দিনেই নিজেদের মধ্যেই বলাবলি করলেন—বেশ ছেলেটি!

তিন বাড়ীর এই মাঝের বাড়ীতে যে রায়-পরিবার ভাড়াটিয়া হয়ে থাকতে এসেছে তারা নিশ্চয়ই চিরটা কাল এখানে থাকতে আসেনি। কিন্তু কতদিন থাকবে? কি বলে ছেলেটি? সঞ্জয় মিত্র খোঁজ নিয়েছেন, পার্থ সেনও খোঁজ নিয়েছেন। জানতে পেরেছেন দু'জনেই, মাত্র এক বছর এরা এই বাড়ীতে থাকবার জন্য এসেছে। ছেলেটি অর্থাৎ পরমেশ রায় ভারত সরকারের হিসাব বিভাগে বেশ ভালো মাইনের একটা সার্ভিসে আছে। কলকাতার অফিসে মাত্র এক বছরের জন্য কাজ করবে পরমেশ, তার পরেই আবার বদলি। বোধ হয় ডিব্রুগড়েই চলে যেতে হবে।

—উঃ, এত দূরে? সঞ্জয় মিত্র আর পার্থ সেন, দু'জনেই যেন চিন্তিত হয়ে পড়েন।

পরমেশ রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ ও পরিচয় হবার পর আরও বেশি চিন্তিত হয়ে পড়লেন সঞ্জয় মিত্র আর পার্থ সেন। প্রায়ই চা-খাওয়ার নিমন্ত্রণ পায় পরমেশ। কোনদিন সকালে সঞ্জয় মিত্রের বাড়ীতে, কোনদিন সন্ধ্যায় পার্থ সেনের বাড়ীতে।

মাত্র এই তো ব্যাপার। কিন্তু এরই মধ্যে পাড়ার নিন্দুকেরা আড়ালে ফিসফাস করতে শুরু করে দিয়েছে, জামাই বাগাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন পার্থ সেন আর সঞ্জয় মিত্তির।

নিন্দুকেরা ভুল ধারণা হয়তো করেনি, কিন্তু নিন্দুকদের ধারণা সত্য হবে বলে মনে হয় না। পাড়ার মেয়েরা সবার আগে বুঝতে পেরেছেন, সঞ্জয় মিত্তির আর পার্থ সেন যে আশায় একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছেন, সে আশা নিতান্তই ভুল আশা। পরমেশের মা নিজেই কথায় কথায় বলে ফেলেছেন —ছেলে বিয়ে করতে চায় না। আমি দশ বছর ধরে ব'লে ব'লে হার মেনেছি, কিন্তু সব বৃথা। ছেলে যেন ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ধরেছে।

সঞ্জয় মিত্র আর পার্থ সেনের বাড়ীতেও এই সমস্যা। দুই বাড়ীতে যেন দুটি মেয়ে ভীষ্ম রয়েছে। মুক্তা মিত্র বিয়ে করতে চায় না, বিদুলা সেনও বিয়ে করতে চায় না।

বি-এ পাশ করার পর আজ প্রায় পাঁচ বছর হ'ল, মুক্তা মিত্র যেন ইচ্ছে করেই এই বাড়ীর একটি ঘরের এক কোণে পড়ে আছে। একটি তানপুরা, আর এক গাদা স্বরলিপির বই, এই নিয়ে মুক্তা মিত্র তার নিজের মনের জগতে লুকিয়ে আছে। গানকেই প্রাণ দিয়ে ভালবাসে মুক্তা। শুধু গান আর গান। মুক্তার জীবন যেন এই সংসারের সব মায়া থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে এক সুরলোকের নীড়ে, মীড় মূর্চ্ছনা গমক আর ঝংকারের মায়ার মধ্যে মুগ্ধ হয়ে বসে আছে।

পিসিমা খুবই বিরক্ত হয়ে মাঝে মাঝে সঞ্জয়বাবুর সঙ্গে ঝগড়াও করেন। —গান-উলীর বয়স কত হ'ল ভেবে দেখ সঞ্জু। কোন্ মুখে আর মেয়েটি মেয়েটি করছিস? মেয়ের বিয়ে দিবি কবে? আমার মতো যখন মেয়ের চুল পেকে শনের নুড়ি হবে, তখন?

পার্থ সেনের ভাইঝি ঐ মেয়েটি, ঐ বিদুলা সেনও বিয়ে করবে না। কখনই না। আই-এ ফেল করার পর থেকে সেই যে ছুঁচ কাঁটা কুরুশ নিয়ে সেলাই-এর বাতিক ধরেছে, তো ধরেইছে। সে-ও তো প্রায় আট বছর হ'ল। দিবারাত্রি শুধু রঙীন সুতো নিয়ে এক বাতিকের খেলা। শুধু ফুল তোলা আর নক্সা আঁকা। বড়দাও রাগ ক'রে বলেন—এতই যদি পারিস, তবে একটা দরজীর দোকান দিয়ে ফেল না বিদুলা।

বিদুলা বলেন—শুধু দরজীর দোকান কেন, আমি রান্নার দোকানও

দিতে পারি। এখুনি যে আমারই হাতের তৈরী পাঁচটা মাছের-চপ টপাটপ খেয়ে ফেললে, সেগুলি কি খেতে খারাপ লাগল ?

বড়দা—তবে তাই কর। একটা রান্নার দোকান দিয়ে ফেল।

বিদুলা—তা হ'লে তো একটা মাথা-টেপার দোকানও দিতে হয়।

বড়দা—কি বললি ?

বিদুলা—তুমিই তো বলেছ, আমি তোমার মাথা না টিপে দিলে ফিজিক্সের কোন ফলমূলাই তোমার মনে পড়ে না : পড়াতে গিয়ে ছেলেদের কাছে নাকাল হও।

অধ্যাপক বড়দা সত্যিই একটু নাকাল হয়ে তারপর একটু হেসে ফেলেন।

বেহালার নতুন সড়কের পাশে নতুন তিনটি বাড়ির উপর দিবারাত্রি নিমের ছায়া দোলে, কিন্তু তিন বাড়ীর জীবনের ভিতরের সমস্যা একটুও দোলে না। সমস্যাটা তেমনি নিরেট হয়ে রয়েছে।

কিন্তু এমন সমস্যার কারণটাই বা কি ? কেন বিয়ে করতে চায় না মাঝের বাড়ীর পরমেশ ? বিয়ের নামে এত ভীত হয় পড়ে কেন এই বাড়ীর মুক্তা, আর ওই বাড়ীর বিদুলা ?

পরমেশের মা'র সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ করার পর পিসিমার মুখে যে সব কথা ফুটতে থাকে সে-সব কথা শুনলে মনে হয়, হ্যাঁ, তাই হবে বোধ হয় ! সমস্যার কারণটা প্রায় আন্দাজ করতে পেরেছেন পিসিমা।

পরমেশের মা'র কাছে পিসিমা বলেন—আমার কি মনে হয় জান ? বয়স একটু বেশি হয়ে গেলে বিয়ে করবার মনই হারিয়ে ফেলে।

পরমেশের মা হাসেন।—আমার ছেলে কিন্তু দশ বছর আগে থেকে, যখন বলতে গেলে ছেলেমানুষই ছিল, তখন থেকেই বিয়ের নামে শুধু না-না করেছে, আজও তাই করছে।

পিসিমা বলেন—তা'হলে বলতে হয়, এরা মনের মতো জন খুঁজে পাচ্ছে না ব'লেই বিয়ে করছে না।

পরমেশের মা বলেন—কিন্তু মনের মতো হয় না কেন বলুন ? আমার ছেলের কথাই ধরুন না, কত ভাল মেয়ে ওকে দেখিয়েছি, কিন্তু মনে তো ধরল না।

পিসিমা—তা হ'লে তো বুঝতে হয় যে, এরা ছাই বুঝতেও পারে না,

মনের মতো জন কে হতে পারে। যেমন আপনার বাড়ীর ছেলে, তেমনি আমার বাড়ীর মেয়ে আর তেমনি হ'ল পার্থ সেনের ভাইঝিটা।

গড়িয়ে চলে দিন, সমস্যাটাও তেমনি খিতিয়ে থাকে, দেখতে দেখতে একটা মাসও পার হয়ে যায়। শুধু পরমেশকে দেখা যায়, কখনও সঞ্জয়বাবুর বাড়ীতে, এবং কখনও বা পার্থবাবুর বাড়ীতে, মাঝে মাঝে চা-এর নিমন্ত্রণে যায়। মুক্তার সঙ্গে চা-এর আসরে যেমন আলাপ পরিচয় হয়েছে পরমেশের, তেমনি বিদুলার সঙ্গেও হয়েছে। দু'দিকে দুই বাড়ীতে দুই মেয়ের সঙ্গে শুধু নমস্কার বিনিময় ক'রে চলে এসেছে মাঝের বাড়ীর ছেলে পরমেশ। ঘটনার দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে সন্দেহ করার মতোও কিছু দেখতে পাওয়া যায় না। যারা নিন্দে করতে চায় তারাও ঠিক বুঝে উঠতে পারে না, কোন বাড়ীর চা বেশী মিষ্টি মনে হয়েছে পরমেশের?

সঞ্জয় মিত্র ভাবেন, মাঝের বাড়ীর পরমেশ এখানে দশ বছর থাকলেই বা কি হবে? পার্থ সেন ভাবেন, ওরা ডিব্রুগড় চলে গেলেই বা কি আসে যায়?

এক মাসের মধ্যে শুধু কয়েকটি দিন, তারপর আর চা-এর নিমন্ত্রণে কোনদিন দু'দিকের কোন বাড়ীতেই পরমেশকে যেতে দেখা যায় নি। পরমেশের সঙ্গে পথে যদি দেখা হয়, তবে শুধু ভারত সরকারের ইকনমিক পলিসি সম্পর্কে পরমেশের সঙ্গে আলোচনা করেন সঞ্জয়বাবু। পার্থ সেনের সঙ্গেও পরমেশের মাঝে মাঝে দেখা হয়। পার্থ সেন বলেন— তা ডিব্রুগড়ই বা কি এমন খারাপ জায়গা? শুনেছি ব্রহ্মপুত্রের ভিউ বড় চমৎকার।

নিন্দুকেরাও হতাশ হয়ে পড়ে। ঘটনার গায়ে একটুও রং ধরল না। মেলামেশার পালিশও চটেছে। চা-এর নেমন্তন্নের আর সেই হাকডাকও নেই। বোধ হয় কোন বাড়ীর চা মিষ্টি মনে হয়নি পরমেশের।

দু'মাস কেন? তারও বেশী হবে। সঞ্জয় মিত্র আর পার্থ সেন গল্প করতে করতে নতুন সড়কের উপর পায়চারী করেন এবং মাঝের বাড়ীর গেটের সম্মুখে দাঁড়িয়ে ফেরিওয়ালার সঙ্গে জিনিসের দামের দরাদরি করেন, এবং চোখেও পড়ে যে, মাঝের বাড়িটা নিঝুম হয়ে রয়েছে। কিন্তু মনেও পড়ে না দু'জনেরই কারও, এই বাড়ীতে মানুষ আছে, এবং পরমেশ নামে এক অল্প বয়সের ভদ্রলোক এখানে থাকেন। পরমেশের সঙ্গে যে এক মাসেরও বেশী হ'ল তাঁদের একবার দেখাও হয়নি, তাও মনে পড়ে না।

কিন্তু মনে পড়ল হঠাৎ এবং দুইজনেই একটু লজ্জিত হয়ে চমকে উঠলেন। দেখতে পেলেন, ডাক্তারের গাড়ি এসে থামল মাঝের বাড়ীর গেটের কাছে।

ডাক্তার বাড়ীর ভিতরে চলে যেতে সঞ্জয় মিত্র বলেন—পরমেশই অসুখে পড়েছে ব'লে মনে হচ্ছে।

পার্থ সেন বলেন—তাই তো অনেক দিন তার দেখা পাই না।

মাঝের বাড়ীর ভিতরে স্বচক্ষে সব দেখার পর চিন্তিত হয়ে পড়লেন সঞ্জয়বাবু ও পার্থবাবু। টাইফয়েড হয়েছে পরমেশের। পরমেশের বিছানার দু'দিকে দুটি টুলের উপর বসে আছে পরমেশের ভাই আর বোন। মাথার কাছে বসে আছেন পরমেশের মা। উদ্বিগ্ন এক একটি মূর্তির চোখের দিকে তাকালে মনে হয়, দিন রাতের কোন মুহূর্তেও এরা ঘুমোয় না। খাওয়া দাওয়ার পাটও বন্ধ হয়ে গিয়েছে বোধ হয়।

সঞ্জয়বাবু আক্ষেপ করেন।—আমাদের একটা খবর দেওয়া উচিত ছিল।

পার্থ সেন বলেন—আপনাদের এখানে তো আর কারও সাড়া শব্দ পাচ্ছি না, রান্নাবান্না করে কে?

পরমেশের মা বলেন—লোক আছে।

ডাক্তার বলেন—ক্রাইসিস পার হয়ে গিয়েছে, এখন আর চিকিৎসা ব'লে কিছু নেই, দরকার হল শুশ্রূষা।

পরমেশের দুই ভাই বোনের দিকে তাকিয়ে ডাক্তার বলেন—এই দুটি বাচ্চা মানুষ যে কী এক্সপার্ট নার্স, তা আর কী বলব মশাই। ওদের দেখতে পেয়ে আমিও নিশ্চিন্ত হয়েছি। খুব ভালো শুশ্রূষা চলছে।

নিশ্চিন্ত হলেন সঞ্জয়বাবু এবং পার্থবাবু। এবং খুশী মনেই চলে গেলেন। চলে গেলেন ডাক্তার। আবার নিঝুম হয়ে যায় মাঝের বাড়ী।

কিন্তু বোধহয় পনর মিনিটও পার হয়নি মাঝের বাড়ির গেটের দরজা হঠাৎ শব্দ করে ওঠে। তারপরেই একেবারে রোগীর ঘরের ভিতরে ঢুকে থমকে দাঁড়ায় এক আগন্তুক।

পরমেশের মা বলেন—বস বিদুলা।

চেয়ারে বসে না বিদুলা। একবার পরমেশের মুখের দিকে তাকায়। ঘুমোচ্ছে পরমেশ। ঘরের ভিতরেই আস্তে আস্তে ঘোরা ফেরা করে বিদুলা। হঠাৎ থামে, রোগীর টেম্পারেচারের চার্ট টেবিল থেকে তুলে নিয়ে পড়তে থাকে। ওষুধের শিশিগুলির দিকে একবার তাকায়। রোগীর দিকে

তাকিয়ে কি-যেন ভাবে। তারপর পরমেশের ভাই-এর কানের কাছে আস্তে আস্তে বলে—বিছানার চাদরটা বদলে দিলে ভালো হয় ভাই।

পরমেশের মা পরমেশের বোনের দিকে তাকিয়ে বলেন—তুই এখন পাখা ছেড়ে দে মিনি। বিদুলাকে নিয়ে বাইরের ঘরে বসে গল্প কর। আমি আসছি এখনি।

চোখ মেলে তাকায় পরমেশ। পরমেশের শুকনো চোখ দুটোই যেন হঠাৎ বিস্ময়ে একটু চঞ্চল হয়ে ওঠে।—আপনি কখন এলেন?

বিদুলা বলে—এখুনি। এখুনি কাকার কাছে শুনলাম যে আপনি অসুখে পড়েছেন।

পরমেশ হাসে—পড়েছিলাম, কিন্তু এখন উঠেছি।

মিনি ডাকে—আসুন বিদুলাদি।

মিনির সঙ্গে বাইরের ঘরে ঢুকেই বিদুলা যেন চমকে ওঠে—একি?

মিনি বুঝতে পারে না…কি বলছেন বিদুলাদি?

বিদুলা—এত সব তানপুরা এস্রাজ বেহালা এখানে কিসের জন্য?

মিনি—দাদার জিনিস। দাদা খুব ভাল গাইতে বাজাতে পারেন। দাদা গানকে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসেন।

বিদুলা—কিন্তু কই, পরমেশ বাবুকে তো কোনদিন গাইতে শুনিনি?

মিনি—না এখানে এসে গান আরম্ভ করতে পারেন নি। এই তো কদিন আগে যন্ত্রগুলি এসে পৌঁছলো, রেলের বুকিং-এর ভুলে পাটনা চলে গিয়েছিল। তারপর হঠাৎ অসুখে পড়লেন দাদা, কাজেই · ।

পরমেশের মা এসে ঘরে প্রবেশ করেন।—আমি যে তোমার নিন্দে শুনেছিলাম বিদুলা। তুমি নাকি খুব অহংকারী, কখনও কারও বাড়ী যাও না।

বিদুলা হাসে—অহংকারী নই, তবে কারও বাড়ী যাইনা ঠিকই।

মিনি হাততালি দিয়ে বলে—তাহলে আমরাই ফার্ষ্ট, বিদুলাদি আমাদের বাড়ীতে ফার্ষ্ট এসেছেন।

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায় বিদুলা। সত্যিই তো। এবাড়ীতে এমন ক'রে ব্যস্ত হয়ে ছুটে আসবার কি দরকার ছিল? মিনি আর মিনির মা আশ্চর্য হয়েছে। আরও অনেকেই হয়তো এক রকম আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করবে। বাড়ী ফেরা মাত্রই তো কাকিমা প্রশ্ন করবেন—কেমন দেখলি পরমেশকে? ভুল

ক'রে হঠাৎ অনেকগুলি প্রশ্নের ভয় জীবনে ডেকে এনে ফেলেছে বিদুলা।

বড় অস্বস্তি বোধ করে, উঠে দাঁড়ায় বিদুলা। ব্যস্তভাবে বলে—আমি যাই।

মিনির মা বলেন—এস আবার।

মিনি প্রশ্ন করে—কবে আসবেন

—দেখি, কবে আসতে পারি। বিড়-বিড় ক'রে বলতে বলতে চলে যায় বিদুলা।

মনে হচ্ছে বিদুলা সেনই বিদুলা রায় হয়ে যাবেন। আড়ালের নিন্দুকেরা যেদিন ফিস ফিস করে, ঠিক সেইদিন। সেইদিন সন্ধ্যায় মাঝের বাড়ীর ভিতর থেকে গানের সুর আর এস্রাজের আওয়াজ উথলে ওঠে। আর, ও দিকের সঞ্জয় মিত্রের বাড়ীর জানলায় একটি ছায়া হঠাৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে। রঙীন শাড়ীর আঁচলের খুঁট আঙ্গুলে জড়িয়ে মাঝের বাড়ীর একটি ঘরের জানলার দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবতে থাকে মুক্তা মিত্র। আবার মন দিয়ে, আর সব আগ্রহ নিয়ে উৎকর্ণ হয়ে শুনতে থাকে। কে সাধছে এমন সুন্দর আশাবরী? পরমেশ বাবু! ভদ্রলোক কি সত্যই গানের মানুষ? অল্প কথা বলেন, আস্তে কথা বলেন, কিন্তু গানের বেলায় একি দরাজ গলা! এই মানুষ যে সেই মানুষই নয়, একেবারে ভিন্ন এক জগতের মানুষ।

আর দেরী করে না মুক্তাকণা মিত্র। মাঝের বাড়ীর গেটের দরজা আবার ঝন করে বেজে ওঠে। গেট খুলে বাড়ীর ভিতরে চলে যায় মুক্তা। মুক্তা মিত্রের মনের সব কল্পনা যেন এতদিনের নির্বাসন থেকে বেড়া ভেঙ্গে ছুটে এসেছে; এক গমকে ভেসে এসেছে মুক্তা মিত্রের মনটাই।

যারা কদিন আগে দেখেছিল, মাঝের বাড়ীর গেট খুলে বিদুলা সেন ঢুকছে বাড়ীর ভিতরে, তারাই আজ মুক্তা মিত্রকেও সেই বাড়ীতে যেতে দেখে আশ্চর্য হয়ে যায়। জমলো নাকি খেলা? তবে কি মুক্তা মিত্রই মুক্তা রায় হয়ে যাবেন?

পরমেশের ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়ায় মুক্তা মিত্র। গান থামিয়ে পরমেশ বলে—বসুন।

মুক্তা বলে—কোন খবর না দিয়ে একেবারে অভদ্রের মতোই এসে পড়লাম পরমেশবাবু। আমি গানকে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসি।

চমকে ওঠে পরমেশ। মুক্তা মিত্রের মুখের দিকে বিস্ময়ের চক্ষু তুলে তাকায়। পৃথিবীতে তাহ'লে সত্যিই আরও একজন মানুষ আছে, যে তারই মত প্রাণের চেয়েও গানকে বেশি ভালবাসে।

মুক্তা বলে—থামবেন না পরমেশবাবু। গেয়ে যান।

পরমেশ—আপনিও গাইবেন তো!

মুক্তা—নিশ্চয় গাইব।

মাঝের বাড়ীর একটি ঘরে সেই সন্ধ্যার মুহূর্তগুলি যেন ঝংকার দিয়ে ঝরে পড়তে থাকে। পরমেশ গান গায়, তারপর মুক্তা, তারপর আবার পরমেশ। সুরলোকের কুহকের মধ্যে ডুবে গিয়ে যেন আত্মহারা হয়ে যায় দুটি মানুষের সুরপিপাসা প্রাণ।

কে না শুনতে পায়, মাঝের বাড়ীর এই সন্ধ্যার সুরময় উৎসবের ধ্বনি? পথ দিয়ে যারা মাথা হেঁট করে চলে যায় তারা শোনে, যারা উঁকি ঝুঁকি দিয়ে চলে যায় তারা শোনে। সঞ্জয়বাবুও কি শুনতে পাননি? নিশ্চয়ই শুনেছেন। তা না হ'লে এরই মধ্যে ব্যস্তভাবে মুক্তার মাকে কাছে ডেকে এই কথা বলতেন না—এখন তো আর কোন বাধা নেই।

মুক্তার মা আশ্চর্য হন—কি?

সঞ্জয়বাবু—এবার পরমেশের মার কাছে তুমি কথাটা তুলতে পার।

মুক্তার মা বলেন—তুলবো।

সঞ্জয়বাবু ভাবেন, পরমেশকে এইবার মাঝে মাঝে চা খেতে ডাকলে ভালো হয়।

পিসিমা তাঁর জপের মালা থামিয়ে হঠাৎ প্রশ্ন করেন।—তোমার মেয়েটি কি সত্যিই বিয়ে করতে রাজী হয়েছে?

সঞ্জয়বাবু বলেন—রাজি হবে ব'লে মনে হচ্ছে।

সবাই যখন শুনেছে, তখন বিদুলাও কি না শুনে আছে?

সারাদিন কাঁটা কুরুশ আর ছুঁচ নিয়ে ফুল তোলার আর নক্সা আঁকার খেলা নিয়ে মনটা যেন বেশ ভালোই মেতে থাকে। শুধু সন্ধ্যা বেলাটাই কেমন যেন হয়ে যায়। ভিতরের বারান্দায় চেয়ারের উপর বসে থাকেন অধ্যাপক বড়দা। ফিজিক্সের ফরমূলা আবার ভুলে যেতে পারেন, তাই চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে বড়দার মাথা টেপে বিদুলা। মাঝের বাড়ীর একটি ঘরের সুরময়

উল্লাসের ঝংকার শোনা যায়। বড়দা হঠাৎ বিরক্ত হয়ে বলেন—প্যারালিসিস হ'ল নাকি তোর। হাত থামিয়ে ভাবছিস কি?

যে-কথা ভাবছিল বিদুলা, সেই কথাই এত তাড়াতাড়ি সত্য হয়ে উঠবে, সেটা এই সন্ধ্যাতেও কল্পনা করতে পারে নি স্বয়ং পরমেশ, এবং মুক্তাও।

সন্ধ্যা শেষ হবার পরেও, এবং গান শেষ হবার পরেও অনেকক্ষণ চুপ হয়ে থাকে মাঝের বাড়ীর একটি ঘর। চলে আসছিল মুক্তা, পরমেশই বাধা দিয়ে বলে।—একটু বস না মুক্তা।

চুপ ক'রে বসে রঙীন শাড়ীর আঁচলের খুঁট আঙুলে জড়ায় মুক্তা। পরমেশ বলে—একটি কথা বলবো?

মুক্তা—বলুন।

পরমেশ—আমিও গানকে প্রাণের চেয়ে বেশী ভালবাসি, তোমারই মতো।

মুক্তা—তা তো বাসবেনই, দেখতেই পাচ্ছি। তা না হ'লে · ।

পরমেশ—কি?

মুক্তা হাসে—তা না হ'লে আমিই বা এখানে আসব কেন?

পরমেশ—কিন্তু গানের মানুষকেও কি ভালবাস?

মুখের উপর আঁচল চাপা দিয়ে ছটফট ক'রে ওঠে মুক্তা।—কেন বাসব না পরমেশবাবু? আপনি মিছামিছি জিজ্ঞাসা করছেন।

পরমেশের দু'চোখের হাসি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।—আজ তাহ'লে এস মুক্তা। কাল আবার···।

মুক্তা বলে—কাল আবার টোড়ি আর ছায়ানট?

পরমেশ—অ্যাঁ? আচ্ছা।

পরমেশ আজ বিশ্বাস করে, তার এতদিনের প্রতীক্ষা আজ সার্থক হয়েছে। কল্পনা একেবারে মূর্তি ধরে চোখের সামনে এসে ধরা দিয়েছে। তার নাম মুক্তা, গানের সুরে বাঁধা একটা সুন্দর জীবন। এই তো পরমেশের জীবনের প্রয়োজন, মনের মত জন।

পরমেশের মা'ও আজ বুঝতে পারেন, কেন এতদিন বিয়ে করতে রাজি হয় নি তাঁর ছেলে। যেমনটি চেয়েছিল পরমেশের মন, ঠিক তেমনটি

আজ ভগবান ওকে পাইয়ে দিয়েছেন। ভালোই হয়েছে। সঞ্জয় মিত্রের মেয়ে মুক্তা দেখতেও বেশ সুন্দর।

মুক্তার পিসিমা কথায় কথায় কত কথাই বলেছেন।—আমাদের বাড়ীর মেয়েটি সংসারের কুটোটিও নাড়তে শেখেনি। মেয়ে শুধু ছবির মতো সাজতে জানে! ও মেয়ে একটা চিৎকার শুনলে মূর্চ্ছা যায়।

—তাতে কি হয়েছে? পিসিমার সব কথা মনে পড়লেও মনে কোন আপত্তি বোধ করেন না পরমেশের মা। এই সংসারে এসেও মুক্তাকে কোন ঝঞ্ঝাটের কুটো নাড়তে হবে না। থাকুক না ছবির মতো সেজে। পরমেশ যদি সুখী হয়, তা হ'লেই হ'ল।

এইবার আর সন্দেহ করবার দরকার হয় না। যারা কিছুই জানতো না, তারাও সব জেনে ফেলেছে। মুক্তা মিত্রই মুক্তা রায় হয়ে যাবেন। ভালো জামাই প্রায় বাগিয়ে এনেছেন সঞ্জয়বাবু। কিন্তু কবে? বিয়ে হবে কবে?

বিয়ের দিন ঠিক করতে পরমেশের মা'র সঙ্গে আলোচনা করবার জন্য এসেছিলেন সঞ্জয়বাবু। কিন্তু আলোচনা হ'ল না। পরমেশের মা বললেন, —পরমেশের শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। আর ক'টা দিন যাক্, তারপর ওর কাছে জিজ্ঞাসা ক'রে নিয়েই আপনাকে জানাব।

—তাই ভালো। চলে গেলেন সঞ্জয় মিত্র। তারপরেই এলেন ডাক্তার। পরমেশ জিজ্ঞাসা করে।—রেস্ট নিতে অ্যাডভাইস করেছেন, কিন্তু কি কম রেস্ট?

ডাক্তার—অফিসে যাবেন না, আর গান-টান একেবারে কমিয়ে দিন।

পরমেশ—আমিও তাই ভাবছিলাম। কদিন থেকে দেখছি, গান বেশি হ'লেই হার্টের ব্যথাটা বাড়ে।

ডাক্তার—তাহ'লে কিছুদিন গান একেবারেই বন্ধ ক'রে দিন।

পরমেশ বলে—বেশ।

গান কিছুদিন একেবারে বন্ধ রাখতে হবে, এর জন্য দুঃখ হ'লেও সে দুঃখ তেমন কিছু নয়। কারণ, তার গানের আশা তো সার্থক হয়েই গিয়েছে। গানের মানুষকেও ভালবাসে মুক্তা।

অসুস্থ শরীর বিছানার উপর এলিয়ে দিয়ে পড়ে থাকে পরমেশ। শরীরটা রেস্ট পায় ঠিকই, কিন্তু মনটা রেস্ট পায় না। কখন্ আসবে সন্ধ্যা? কখন্

আসবে মুক্তা ? আজ সন্ধ্যায় সুরে সুরে মুখর হয়ে উঠবে না এই ঘর, কিন্তু তার জন্য কোন দুঃখ করবার দরকার হয় না। কল্পনা করতে পারে পরমেশ, গভীর নীরবতার মধ্যে, এই ঘরের ভিতরে একটা বুকজোড়া শান্ত অচঞ্চলতার মধ্যে মুক্তার মুখের দিকে তাকিয়ে আর কোন কথা না ব'লে যদি সন্ধ্যাটা পার হয়ে যায়, তাই বা কি কম লাভ ? সে-ও এক নীরব সুরের আনন্দ।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে, ঘড়ির দিকে তাকায় পরমেশ।

ঘরের ভিতরে ঢুকে চমকে ওঠে মুক্তা—একি ? গানের মেয়ে যেন ঘরের এই নীরবতায় ভয় পেয়ে চমকে উঠেছে।

পরমেশ হাসে—কিছুই না মুক্তা। শরীরটা একটু অসুস্থ, এই মাত্র।

মুক্তা বলে—তাহ'লে আজ শুধু দুটো আশাবরী। বেশিক্ষণ থাকব না।

পরমেশ—ডাক্তার আমাকে রেস্ট নিতে বলেছেন। গান কিছুদিন বন্ধ রাখলেই ভালো হয়।

মুক্তা আশ্চর্য হয়—গান বন্ধ রাখবেন আপনি ? তা হ'লে ··তা হ'লে আমি এখন কি করি ?

পরমেশ—তুমি সত্যি গান শুনতে চাও ?

মুক্তা হাসে—নিশ্চয় শুনতে চাই।

আস্তে আস্তে উঠে বসে পরমেশ। তানপুরা হাতে তুলে নেয়। আস্তে আস্তে বলে—কি বলছিলে মুক্তা ? আশাবরী ?

মুক্তা—হ্যাঁ।

সুরলোকের আশাবরী এই ঘরের বাতাসে মূর্চ্ছনা ছড়ায়। মুগ্ধ দুটি চক্ষু নিয়ে বসে থাকে মুক্তা। যেন সত্যিই দেখতে পাচ্ছে মুক্তা, পরমেশের গানের ভাষা সুরের ছোঁয়ায় রঙীন হয়ে ফুলঝুরির মতো ঝরে পড়ছে।

গান শেষ হয়। মুক্তা মিত্রের কালো চোখের চাহনি আর সুন্দর ভুরু যেন ব্যথিত হয়েছে। মুক্তা বলে—আপনার আজকের আশাবরীটা কেমন যেন হয়ে গেল।

পরমেশ বলে—কিন্তু গান গেয়ে ভুল করলাম। হার্টের ব্যথাটা সত্যিই বাড়ছে।

আস্তে আস্তে হাঁপাতে থাকে পরমেশ। মুক্তা মিত্র বলে—আমি এখন যাই। কাল আবার···।

পরমেশের দু'চোখে যেন একটা যন্ত্রণার বিস্ময় দপ্ ক'রে ফুটে ওঠে।

—কাল আবার গান গাইতে পারব না। গান কিছুদিন বন্ধ রাখতেই হবে।

মুক্তা হাসে—বেশ তো, গান বন্ধ রাখুন কিছুদিন। তারপর, যেদিন আবার গাইবেন, সেদিন আসব। চলে যায় মুক্তাকণা মিত্র।

সন্ধ্যা হয়েছে, তবু কেন মাঝের বাড়ীর একটি ঘরে সুর আর সুরের ঝংকার বাজে না? পাগ সেনের বাড়ীর বারান্দায় একটি ছায়া নিজের মনের চঞ্চলতায় এলোমেলো ভাবে ঘুরে বেড়ায়। বিদুলা শুধু কল্পনা করতে পারে—আজ বোধহয় একসঙ্গে বেড়াতে বের হয়েছে দুটি মানুষ, যারা প্রাণের চেয়ে গান বেশি ভালবাসে। ওরা দুজন একই নালায় দুটি ফুল। বেশ হল, ভালোই হয়েছে।

ভালো লাগে না শুধু একটি কথা ভাবতে। কেন সেদিন অমন ক'রে বেহায়ার মত ছুটে গিয়েছিল বিদুলা, একটা রোগা মানুষ ক দেখবার জন্য? শুধু নিজের মনের কাছে নয়, কাকিমার চোখের কাছেও যে নিজেকে ধরা পড়িয়ে দিয়েছে বিদুলা।

কাকা আর কাকিমার চাপা গলার কথাবার্তাও শুনতে পেয়েছে বিদুলা। কাকীমা রাগ করেছেন, কাকার মনটাও কেমন একটু ব্যথিত হয়েছে। সঞ্জয় মিত্রের সঙ্গে আর তেমন করে জোর গলায় গল্প করতে পারেন না কাকা। আক্ষেপ করেছেন কাকিমা।- এতদিন গম্ভীর হয়ে থেকে, হঠাৎ সেদিন এক দৌড়ে ছুটে চলে গেল কেন বিদুলা? গেলই যদি, তবে হঠাৎ আবার এক দৌড়ে পালিয়ে এল কেন? এসব মেয়ের মনের রকম বোঝা ভার।

কাকা বলেন—না গেলেই ভালো হতো। তা হ'লে কানাইবাবু আমাকে ওরকম একটা প্রশ্ন করতে পারতেন না।

কাকিমা বলেন—আমি মনে করেছিলাম, পরমেশই বুঝি ওকে ডেকেছে।

কাকা—না, কেউ ওকে ডাকেনি। আমিই ওকে খবরটা দিয়েছিলাম। আসল কথা হল, মেয়েটার মনটাই একটু অন্য রকমের কি না। দেখলে না, সে নিজের হাতে বার্লি তৈরী করে নিজেই মতিরামের বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে এল।

কাকিমা—কি হয়েছে মতিরামের?

কাকা—বসন্ত হয়েছে।

কাকা ও কাকিমা'র চাপা স্বরের বার্তালাপ শুনতে ভালো লাগে, খারাপও লাগে। বিদুলার মনটাই অন্য রকমের। সে মন নিয়ে চাকর মতিরামের বাড়ীতে ছুটে যাওয়া যায়, কিন্তু সে মন নিয়ে এই রকম গানের মানুষের কাছে ছুটে যাওয়া নিতান্তই ভুল সাহস।

হঠাৎ শোনা যায়, ওদিকের বাড়ীর একটি ঘরের জানালা দিয়ে গানের সুর ছড়িয়ে পড়ছে সন্ধ্যার বুকে।

গান গাইছে মুক্তা। এরপর নিশ্চয় গান গাইবেন মুক্তার মনের মতো জন, সেই ভদ্রলোক। পার্থ সেনের বাড়ীর বারান্দায় শান্তভাবেই ঘুরে বেড়ায় একটি উৎকর্ণ কৌতূহলের ছায়া। এক গানের পর অন্য গান গাইছে মুক্তা। কিন্তু পরমেশ রায়ের গান শোনা যায় না কেন?

—একি? নিজের মনেই চমকে ওঠে বিদুলা। গান বন্ধ করেছে মুক্তা। আজ সন্ধ্যার মতো মুক্তার গানের পালা শেষ হল। তবে পরমেশ রায় এখন কোথায়? মুক্তা কি একাই গাইছিল গান? তার গানের আনন্দের কাছে আর একজন কেউ কি এতক্ষণ বসে ছিল না?

কেমন ক'রে কল্পনা করবে বিদুলা? বিদুলা যে এখনও কিছুই শুনতে পায়নি। সেই ভদ্রলোক যে এখন তাঁর নিজের ঘরের বিছানার উপরে একা পড়ে আছেন, আর ছোট্ট মিনি শুধু তাঁর মাথার কাছে বসে পাখার বাতাস করছে!

আর, মুক্তার পিসিমাও যে ঐ মাঝের বাড়ীর আর এক ঘরের ভিতরে বসে পরমেশ রায়ের মা-এর সঙ্গে এখন কথা বলছেন।

পিসিমা বলেন—আমাদের মেয়েটির ঠিক উল্টোটি হলেন ও বাড়ীর মেয়েটি। সংসারের যত কাজের কুটো কুড়িয়ে সারাদিন খাটবে। পাঁচ-রকমের পথ্যি আর দশ রকমের রান্না রাঁধবে। এর মাথা টেপ, ওর গা ধোয়াও, তার মুখে ওষুধ ঢেলে দাও, এই নিয়েই দিব্যি দিন কাটিয়ে দিচ্ছে পার্থ সেনের ভাইঝিটা। আমি বলি সংসারের পাঁচ কাজের জন্য যখন এতই শখ তবে বিয়ে করতে চাস না রে কেন ছুঁড়ি!

পরমেশের মা বলেন।—আহা, বড় সুন্দর মেয়ে তো!

পিসিমা—না গো, তেমন কিছু সুন্দর নয়, আমাদের মুক্তোর তুলনায় কিছুই নয়।

পরমেশের মা হাসেন।—আমি দেখেছি বিদুলাকে এখানেও এসেছিল একদিন।

চলে গেলেন পিসিমা। তার পরেই পরমেশের ডাক শুনতে পান পরমেশের মা।—শরীরটা খুবই খারাপ বোধ করছি মা। ডাক্তার ডাকতে লোক পাঠাও।

আবার নিঝুম হয়ে যায় মাঝের বাড়ী। দিনে তিনবার ডাক্তার আসেন আর চলে যান। দশদিনেরও বেশি হয়ে গেল, জ্বর আর বুক ব্যথা নিয়ে বিছানার উপর ছটফট করে পরমেশ। সঞ্জয়বাবু আর পার্থবাবু, দু'জনেই এসেছিলেন। দেখে একটু চিন্তিত হয়ে চলে গিয়েছেন দু'জনেই।

মাঝে মাঝে আবছা ঘুমের মধ্যে যেন দরজার কাছে পায়ের শব্দ শুনতে পায় পরমেশ। মুখ ঘুরিয়ে দরজার দিকে তাকায়। মা বলেন—মুক্তা তো একবারও এল না।

পরমেশ—মুক্তার তো আসবার কথা নয়।

পরমেশের মা আশ্চর্য হন—তার মানে?

পরমেশ—এখন তো আমি গান গাইতে পারব না, মুক্তা এসে করবে কি?

পরমেশের মা আরও আশ্চর্য হন—এর মানে কিছু বুঝলাম না।

পরমেশ—মুক্তা এখন আসবে না, আসতে পারে না, তার এসেও কাজ নেই।

ছোট্ট মিনি চেঁচিয়ে ওঠে। তবে বদুলাদি আসুক না কেন? সেদিন তোমার অসুখের সময় বিদুলাদিই তো এসেছিলেন।

চুপ ক'রে থাকে পরমেশ! চুপ ক'রে ভাবতে থাকেন পরমেশের মা। বিদুলা কি আসবে? অসম্ভব? আসবেই বা কেন? মুক্তার সঙ্গে যে মানুষের বিয়ের কথা পর্যন্ত হয়ে গিয়েছে এবং রটেও গিয়েছে, তার কাছে সে বেচারী আসবে কেন?

কল্পনা করতে পারছেন না, জানেনও না, পরমেশের মা, ঠিক এই সময়েই ওদিকের বাড়ীর বাইরের ঘরের দরজার কাছে একটা অভিমানী বাধার মতো পথ আটক ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন বিদুলার কাকিমা—যেও না, যেতে পারবে না বেহায়া মেয়ে।

বিদুলা বলে—বেহায়া বৈকি। কিন্তু যেতে দাও কাকিমা।

কাকিমা—কেন যাবে ?

বিদুলা হাসে—যেতে ইচ্ছে করছে, তাই।

কাকিমা—অপমানের ভয় নেই ?

বিদুলা—না, অপমান যা হবার হয়েই গিয়েছে, আর নতুন ক'রে অপমানের ভয় কোথায় ?

কাকিমা—অপমানের ভয় না হয় নেই, কিন্তু ওখানে গিয়ে তোর লাভটা কি ? ওর তো মুক্তার সঙ্গে বিয়ের কথা হয়েই গিয়েছে।

বিদুলা—জানি।

কাকিমা—তবে ?

বিদুলা—একটা রোগী মানুষকে দেখতে যাব আর চলে আসব, এর মধ্যে ক্ষতিটাই বা কি ?

হঠাৎ ছলছল ক'রে চোখ, ছটফট ক'রে চেঁচিয়ে ওঠে বিদুলা—আমি একবার না যেয়ে, নিজের চক্ষে একবার না দেখে থাকতে পারছি না কাকিমা। জীবনে এই প্রথম বেহায়া হয়েছি ; আর একটু বেহায়া হতে দাও।

আর বাধা দেন না কাকিমা।

পরমেশের অসুখ সারতে সময় নিল অনেক। প্রায় আরও একমাস। বেহালার নতুন সড়কের নিম আবার নতুন ফুলে ছেয়ে গিয়েছে।

শুধু সেদিন নয়, প্রতিদিনই মাঝের বাড়ীতে এক রোগীর বিছানার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে ওদিকের বাড়ীর, ঐ পার্থ সেনের ভাইঝি বিদুলা। কাকিমাও আর রাগ করেন নি। বরং রোজই একই প্রশ্ন করেছেন—পরমেশ আজ কেমন আছে বিদুলা ?

পরমেশের মা'ও নিজের চক্ষেই দেখেছেন, এই মেয়ে একেবারে অন্য রকম মনের মেয়ে। মুক্তার ঠিক উল্টোটি। ঠিকই বলেছিলেন মুক্তার পিসিমা। সংসারের যত জ্বর-জ্বালার গায়ে হাত বুলোবার জন্য পার্থ সেনের এই ভাইঝির হাত দুটো যেন নিসপিশ করে, সাগু জ্বাল দেবার জন্য আর বার্লি তৈরী করবার জন্য তৈরী দুটো পাকা-পোক্ত হাত।

বিদুলা সেনকে শুধু একটা বিপদে পড়তে হল শেষ সন্ধ্যায়। সেই সন্ধ্যায় ডাক্তার এসে পরমেশকে ব'লে গেলেন—কাল থেকে অফিসে যেতে পারেন।

চলে গেলেন ডাক্তার, কিন্তু চলে আসতে পারল না বিদুলা। পরমেশই অনুরোধ করে। আর কিছুক্ষণ থেকে যাও বিদুলা।

ঘর বড় নীরব। বড় বেশি সুরময় সেই নীরবতা। পরমেশ বলে—এ রকম সুন্দর মন তুমি কোথায় পেলে বিদুলা?

বিদুলা যেন হঠাৎ ভয় পেয়ে হাঁপাতে থাকে।—আমাকে এসব কথা আপনার বলা উচিত নয় পরমেশবাবু।

পরমেশ—তোমাকেই তো বলব।

বিদুলা আশ্চর্য হয়—কেন? আপনি তো প্রাণের চেয়ে গান বেশি ভালবাসেন।

পরমেশও হাসে—ঠিকই সন্দেহ করেছে বিদুলা। গান আমার প্রাণের চেয়েও বেশি।

বিদুলা হেসে ফেলে—তবে আর কি।

পরমেশ—কিন্তু তুমি যে আমার গানের চেয়েও বেশী।

চলে গেল বিদুলা। এবং যারা আড়াল থেকে আর উঁকি ঝুঁকি দিয়ে অনেক কিছু বুঝে ফেলে, তারাই আর এক মাস পরে বলাবলি করে—আরে কি আশ্চর্যের কথা, শেষে বিদুলা সেনই বিদুলা রায় হয়ে গেল!

## দেবতারে প্রিয় করি

সংসারের উপর রাগ করে নয়, বিরক্ত হয়েও নয়, সংসারকে চিনতে পেরেছেন বলেই এইবার একটু সাবধান হয়েছেন সনাতনবাবু। সংসার যেন আর মন কেড়ে না নেয়। এই মাত্র। সাবধান হবার মত বয়স হয়েছে সনাতন বাবুর, সময়ও হয়েছে।

আর কেন এত মায়া, এত উদ্বেগ আর এত চিন্তা? সংসারের জন্য অনেক খেটেছেন, চোখের জলও ফেলতে হয়েছে অনেক, কিন্তু আর নয়। সনাতনবাবু এইবার একটু আলগা হয়েই থাকতে চান। কাজের জীবনের স্বেদ ক্লান্তি ও চঞ্চলতা থেকে রেহাই পেয়েছেন এতদিনে। এখন শুধু খেয়াঘাটের মাটিতে দাঁড়িয়ে বেলা-শেষের আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা এক প্রতীক্ষার জীবন, যতদিন না সেই ডাক আসে আর চলে যেতে হয়।

কিন্তু এই প্রতীক্ষার শান্তি যেন ক্ষুণ্ণ না হয়, তাই সাবধান হয়েছেন সনাতনবাবু। এতদিন ধরে অনেক শ্রান্ত ও ক্লান্ত হয়েছেন তিনি, এইবার শুধু শান্ত হতে চান।

জীবনে শোকের আঘাত পেতে হয়েছে অনেক বার। তিন ছেলে ও দুই মেয়ের মধ্যে বেঁচে আছে শুধু একজন, একটি ছেলে। সেই সব দুঃসহ বেদনার দিনে সনাতনবাবুর সিক্ত চক্ষুর বেদনাকে সান্ত্বনা দিয়ে শান্ত করার জন্য নিজের চোখে জল নিয়ে যিনি সামনে এসে দাঁড়াতেন, তিনিও আজ আর নেই। অনেক মায়া আর যত্নে একটি মাত্র ছেলেকে বড় করে দিয়ে সনাতনবাবুর স্ত্রী সব মায়ার ধরাছোঁয়ার অতীত হয়ে গিয়েছেন অনেকদিন আগেই।

একটি মাত্র ছেলে হরেন, সে ছেলে বড় হয়েছে, নানা বিদ্যার ডিগ্রী লাভ করেছে, এখন এক ভাল কলেজে অধ্যাপনা করছে, এবং মাইনে পাচ্ছে ভালই। সুতরাং, অর্থচিন্তার বন্ধন থেকে সনাতনবাবু এইবার মুক্ত হতে পেরেছেন। পঁয়ত্রিশ বছর ধরে এক ক্ষান্তিহীন খাটুনির চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করে এইবার সনাতন বাবু চিন্তা করতে পারছেন তাঁরই কথা, জীবনের এই অবসরটুকু যাঁর চিন্তায় উৎসর্গ করে দিতে পারলে শান্ত হয় জীবন।

সংসারের প্রতি আর একটি যে কর্তব্য ছিল, তাও চুকিয়ে দিয়েছেন সনাতন বাবু। হরেনের বিয়ে দিয়েছেন। পুত্রবধূ কমলাও সত্যিই গৃহলক্ষ্মী। সুতরাং সনাতন বাবুর মনে এখন আর কোন আক্ষেপও নেই। সংসারকে তুচ্ছ করেননি, সংসারের সঙ্গে বিরোধও করেননি, বরং সংসারকে বেশ সুখী করে দিয়ে সব কর্তব্য আর দায় বুঝিয়ে দিয়ে তিনি নিজে এইবার ছুটি নিয়েছেন।

এখন তাঁর হাতের কাছে শ্রীমদ্ভাগবত আর চোখের সম্মুখে দেওয়ালের গায়ে টাঙানো ছবিতে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী শ্রীবিষ্ণু। আর, মনের মধ্যে এই মূর্তিরই ধ্যান। চুলচেরা বিচার প্রশ্ন আর তর্ক নিয়ে তত্ত্বের ভীড়ের মধ্যে ঢুকবার জন্য কোন আগ্রহ নেই সনাতন বাবুর; তিনি সরল বিশ্বাসের মানুষ এতদিন ধরে জীবনের প্রত্যেক আপদে ও আঘাতে হঠাৎ যাঁকে একটি নাম ধরে ডেকে উঠতেন, আজ এই অবসরের জীবনে তাঁকেই সারাক্ষণ ধরে এবং সারা মন নিয়ে সেই নামেই ডাকছেন সনাতন বাবু। নারায়ণ! নারায়ণ! আগে মাঝে মাঝে শুধু বেদনার মধ্যে যাঁকে ডাকতেন, আজ এই অবসরময় জীবনের শান্তির মধ্যে তাঁকেই ডেকে ডেকে আরও বড় শান্তির স্বাদ মনেপ্রাণে পেতে চাইছেন সনাতন বাবু।

নিজের সংসার প্রিয় ছিল এতদিন, এইবার দেবতাকেও প্রিয় করবার দিন এসেছে। তাই সংসারের কোন মায়ায় নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে আর চান না সনাতন বাবু। এই গৃহে আজও কলরব আছে, ভাবনা আছে, হাসির উচ্ছ্বাস আর অভিমানও আছে। ছেলের বিয়ে দেবার পর থেকে এই গৃহেরই মধ্যে সাংসারিক মায়াগুলি যেন আরও নতুন হয়ে জেগে উঠেছে। উঠুক, থাকুক, ভালই, কিন্তু সনাতন বাবু এই ভালর ভাবনা চঞ্চলতা ও মোহ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন।

হরেনও গৃহজীবনের কোন সমস্যা ও দুশ্চিন্তার মধ্যে সনাতন বাবুকে ডেকে আনে না। পিতার অবসর-জীবনের শান্তিকে বিচলিত করতে চায় না। কমলাও শ্বশুরের এই শান্তির আগ্রহকে শ্রদ্ধা করেই চলে। ধ্যান পূজা জপ আর দেবতার চিন্তা নিয়ে বাড়ির এক নিভৃতে শান্ত হয়েছেন বুড়ো মানুষ, থাকুন না, তাঁকে আর সংসারের ভালমন্দর চিন্তার মধ্যে টেনে লাভ কি? যেমন হরেন, তেমনি কমলা, দুজনেই সারাক্ষণ সতর্ক থাকে, সনাতন বাবুর এই নির্লীপ্ত জীবনের শান্তি যেন তাদের কোন আচরণের ভুলে ক্ষুণ্ণ না

হয়। সনাতন বাবুর জন্য ফুল গঙ্গাজল আর আসন ঠিক সময়ে ঠিক জায়গাতেই সাজানো থাকে। আত্মীয় কুটুম্ব যাঁরা আসেন, তাঁদের অনেকেই জায়গা-জমি চালের দর আর চা-বাগানের শেয়ারের কথা বলতে ভালবাসেন। কিন্তু হরেন আর কমলা সাবধানে থাকে, অভ্যাগতদের স্মরণ করিয়ে দিতে ভোলে না—বাবার কাছে গিয়ে ওসব কথা আর আলোচনা করবেন না উনি ওঁর নারায়ণ নিয়ে শান্তিতে আছেন, শান্তিতে থাকতে দিন।

ঘরের মধ্যে ঝি-চাকরকেও কথাবার্তার স্বর মৃদু করে রাখতে হয়। যেন কোন সোরগোল না হয়। আজে বাজে ভিখিরীর দল এসে চিৎকার করে ওদিকের দরজার কাছে; এদিকে সনাতন বাবুর ঘরের দরজার কাছে শুধু একজন বৈরাগী ভিখিরী আসবার সুযোগ পায়। বিষ্ণুনাম গান করে চলে যায় সেই বৈরাগী।

এই বাড়ীর বাতাসে নবজাত প্রাণের কান্না বেজে উঠল একদিন। সনাতনবাবু তখন পূজোয় বসেছেন মাত্র এবং কান্নার স্বর তাঁর কানে এসে পৌঁছতেই তাঁর শান্ত চক্ষুর তারকা হঠাৎ একটু চমকেও উঠলো। নারায়ণ! নারায়ণ! প্রিয় দেবতার নাম উচ্চারণ করে এবং বিষ্ণুমূর্তি স্মরণ করে শান্তমনেই পূজা সমাপন করলেন সনাতনবাবু।

বাড়ির বাতাসকে হঠাৎ ধ্বনিময় করেছিল যার কান্না তাকে চোখ মেলে দেখলেনও সনাতনবাবু। ফুলের মত একটা কচি মানুষের টুকটুকে দেহ তোয়ালে দিয়ে জড়িয়ে নিয়ে ধাই এসে হাসিমুখে সনাতনবাবুর সামনে দাঁড়ালো, আর বললো—নাতিকে দেখুন। দেখলেন সনাতনবাবু; তার পরেই নারায়ণের মূর্তি স্মরণ করে চোখ বন্ধ করলেন।

কয়েক মাস পরে এই বাড়িরই মধ্যে একদিন একটু বেশি সোরগোলের সাড়া শুনতে পেয়ে হঠাৎ একটা কৌতূহল যেন ব্যস্ত হয়ে উঠলো সনাতনবাবুর মনে। একটা উৎসবের মুখরতার মত সেই সোরগোলের অর্থ কল্পনাতে সহজেই বুঝে নিলেন, এবং তার পরেই হরেন ও কমলাকে ডাক দিয়ে বললেন—ওর নাম রাখ নারায়ণ।

তবে কি সংসারের জন্য আবার কোন আগ্রহ দেখা দিল সনাতনবাবুর মনে? না, হরেন আর কমলাও বুঝতে পারে যে, এই সংসারেরই একটা

নতুন মানুষের নামকে দেবতার কথা স্মরণ করিয়ে দেবার ডাক করে রেখে দিলেন সনাতনবাবু। নাতিকে কেউ নাম ধরে ডাকলেই নাতির দাদুর মনে তাঁর প্রিয় দেবতার মূর্তি জেগে উঠবে। তাই এই নির্দেশ।

সনাতনবাবুর নির্দেশই সবাই মেনে নিল। তাঁর নাতির নাম রাখা হলো নারায়ণ। ঘরের ভিতরে ফিরে গিয়ে হরেন কমলাকে হেসে হেসে বলে—ভালই হলো, ছেলেকে যদি চিৎকার করে ডাক, তবুও বাবার মনের শান্তি নষ্ট হবে না।

কমলাও হাসে—ভালই হলো।

হ্যাঁ, ভালই হলো। সনাতনবাবুর নাতি বড় হয়ে উঠতে থাকে, আর সেই সঙ্গে বড় হতে থাকে নাতির দুষ্টুমি ও চাঞ্চল্য। কিন্তু নাতির এই দুষ্টুমি ও চাঞ্চল্যের কিছুই দেখতে পান না সনাতনবাবু। সনাতনবাবুর নিভৃতের শান্তি যেন দুরন্ত ছেলের উপদ্রবে ক্ষুণ্ণ না হয়, সেদিকে লক্ষ্য আছে হরেনের ও কমলার। এই বাড়ির ঐ দুরন্ত একটি মায়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার জন্য কোন আগ্রহও নেই সনাতনবাবুর মনে। নাতিকে দেখতে চান না সনাতনবাবু, দেখতে পানও না, শুধু শুনতে পান। এই বাড়ির এতদিনের শান্ত বাতাসে একটা ডাক ছুটাছুটি করছে। ও নারায়ণ! ওরে নারায়ণ! কখনো হরেন, কখনো কমলা, কখনো বা ঝি চাকর, দুরন্ত ছেলেকে খুঁজে খুঁজে ডাকতে থাকে। হয়ত বাগানের এক কোণে ছোট বকুলের কাছ থেকে ধুলোখেলা ছেড়ে দিয়ে ছুটে আসে নারায়ণ।

কদাচিৎ কখনো নাতিকে চোখে দেখতে পান সনাতনবাবু, যখন ঐ ছোট বকুলের কাছে ধুলো খেলতে আসে নারায়ণ, তখন। বারান্দার উপর এক চেয়ারে জপের মালা হাতে নিয়ে বসে থাকেন সনাতনবাবু, আর ছোট বকুলের ছায়ার দিকে হঠাৎ চোখ পড়তেই দেখতে পান, দু'হাতে ধুলো ঘাঁটছে তিন বছর বয়সের একটা মানুষ। একবার তাকিয়েই চোখ বন্ধ করেন সনাতন বাবু, অথবা ভাগবতের পাতা খুলে পড়তে থাকেন। ডাক শোনা যায়, নারায়ণ, নারায়ণ। ঝি চেঁচিয়ে ডাকছে। সনাতনবাবুর মনে মূর্তি জাগে, প্রিয় দেবতার মূর্তি।

আরও শান্ত এবং আরও প্রসন্ন হয় সনাতনবাবুর চোখের দৃষ্টি। বিষ্ণু-ধ্যানের স্তোত্র মনের মধ্যে মৃদু গুঞ্জরণ করে বেড়ায়। দেবতার মূর্তি ফুটে উঠেছে সনাতনবাবুর মনের গভীরের এক আকাশে। কি নয়নাভিরাম সেই

মূর্তি! শঙ্খ চক্র গদা ও পদ্ম, বৈজয়ন্তী মাল্য ও কৌস্তুভ মণি, কিরীটে ও কুণ্ডলে শোভিত দেবতা। জ্ঞানীরা বলেন, এবং সাধকেরা তো দেখতেই পান, এই সুন্দর পীতাম্বর দেবতার ভ্রূপল্লবের শিহরে সৃষ্টিস্থিতি-লয়ের রহস্য শিহরিত হয়।

আর একদিন, সেদিনও সবেমাত্র পূজায় বসেছেন সনাতনবাবু। এই বাড়ির বাতাসে বেজে উঠলো সেই ডাক—নারায়ণ, নারায়ণ। সোরগোলও শোনা যায়। অনেক পায়ের শব্দও ছুটাছুটি করছে। কিন্তু সকল শব্দ ছাপিয়ে শুধু একটি ডাক বাজছে—নারায়ণ, নারায়ণ। কী তীব্র, কী করুণ বুকের পাঁজর চূর্ণ করা সেই ডাক। যেন কেউ একটা হিংস্র কামড় দিয়ে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ঐ সংসারটার সবচেয়ে বড় লোভের আদরের আর মায়ার কোন জিনিসকে। হঠাৎ মনে পড়ে সনাতনবাবুর, ঠিকই তো, অনেকদিন হলো ঐ বকুলের ছায়ার কাছে সেই ছোট্ট মানুষটাকে ধুলো খেলতে আর দেখা যায়নি। সত্যিই কি ধুলোখেলার সেই মানুষটাই চলে যাচ্ছে?

সত্যিই তাই, বুঝতে দেরী হয়নি সনাতনবাবুর। শোকাহত এক সংসারের বিলাপ বাতাস মথিত করছে। তার মধ্যে শুধু আছাড় খেয়ে বাজছে সনাতনবাবুরই দেবতার নাম—নারায়ণ, নারায়ণ। চিৎকার করে নাম ধরে ডাকছে আর আকুল হয়ে কাঁদছে বাড়ির ভেতরের মানুষগুলি!

শুধু একবার মাত্র শিউরে ওঠে সনাতনবাবুর পূজার হাত, চোখের তারা এক মুহূর্তের মত শুধু একটু কঠিন হয়ে ওঠে। কিন্তু পর মুহূর্তেই, এই বাড়ির আহত বাতাসের গ্রাস থেকে নিজের মনটাকে ছিন্ন করে এক ভিন্ন আকাশের কোলের উপর নিক্ষেপ করেন সনাতনবাবু। দেখতে পান, শঙ্খ চক্র গদা ও পদ্ম নিয়ে উজ্জ্বল অদ্ভুত ও সুন্দর এক মূর্তি যেন তাঁর বুকের কাছে আপন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শান্ত মনে পূজা করতে থাকেন সনাতনবাবু। ধীর স্বরে স্তব আবৃত্তি করতে করতে অদ্ভুত এক শান্তির গভীরে মনটাকে ডুবিয়ে দিতে থাকেন। বাড়ির আহত বাতাসও সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কেঁদে হাঁপিয়ে ও ক্লান্ত হয়ে শেষে ঘুমিয়ে নীরব হয়ে যায়।

ব্যথাহত সংসারের পাশেই যেন ব্যাথার অতীত এক শান্তির ঠাঁই পেয়ে

গিয়েছেন সনাতনবাবু। আকাশে সেই রকমই আলো জাগে সকালবেলায়, আর শালিক লাফালাফি করে বকুলের পাতার আড়ালে। সেই বৈরাগী ভিখারী আসে, আর বিষ্ণুনাম গান করে চলে যায়। পূজার ফুল গঙ্গাজল আর আসন ঠিক সময়ে ঠিক জায়গাতেই সাজানো থাকে। হাতের কাছে ভাগবত, আর চোখের সামনে দেওয়ালের গায় রঙীন ছবির

কিন্তু, হঠাৎ একদিন ব্যস্তভাবে ডেকে উঠলেন সনাতনবাবু—বউমা, ও বউমা।

কমলা কাছে এসে দাঁড়ায়। সনাতনবাবু বলেন,—না, কিছু না। চলে যায় কমলা।

তবু, আবার একদিন, এবং তারপর থেকে প্রায়ই হঠাৎ ডেকে ওঠেন সনাতনবাবু।—ও হরেন, ও বউমা। হরেন আসে, কমলাও আসে। কিন্তু সনাতনবাবু বলতে পারেন না, কি হয়েছে তাঁর, আর কেনই বা ডাকছেন।

বারান্দার চেয়ারের উপর বসে আর জপের মালা হাতে নিয়ে তেমনি বসে থাকেন সনাতনবাবু। নারায়ণ নারায়ণ—চোখ বন্ধ করে নাম উচ্চারণ করা মাত্র চোখ মেলে তাকিয়ে ফেলেন। দেবতার মূর্তি স্মরণ করতে গিয়ে বোধহয় বার বার বাধা পাচ্ছেন সনাতনবাবু

ছটফট করেন সনাতনবাবু, যেন তাঁর প্রিয় দেবতার মূর্তি ঐ ডাক শুনেই দূরে পালিয়ে গিয়ে কোথায় লুকিয়ে পড়ছে, খুঁজে পাচ্ছেন না সনাতনবাবু। কই সেই শঙ্খ চক্র গদা আর পদ্ম? সেই বৈজয়ন্তী মালা আর কৌস্তুভ মণি-হার? কি হলো? কি হলো? জলভরা মেঘের বেদনার মত কি যেন একটা বেদনার ছায়া এসে ঝাপসা করে দিচ্ছে তাঁর চোখের দৃষ্টি। দেখতে পাচ্ছেন না দেবতার মূর্তিকে। ঐ নামে দেবতাকে ডাকতে গিয়ে তিন বছর বয়সের একটা মানুষের মূর্তি শুধু মনের মধ্যে জেগে ওঠে। ঐ নাম, ঐ প্রিয় দেবতার নাম যেন একটা আঘাত, তাই বার বার সেই আঘাতে চোখ খুলে যায় সনাতনবাবুর; আর দেখতে পান শুধু·· ঐ যে, ও কে? কেরে তুই? চেঁচিয়ে ওঠেন সনাতনবাবু—বউমা শিগ্‌গির এস।

কমলা কাছে এসে দাঁড়ায়। সনাতনবাবুর শান্ত ও উদাস দুই চক্ষু কাঁপতে থাকে। তারপর বলেন—আমার এ কি হলো বউমা?

কমলা বিস্মিত হয়—কি হলো বাবা ?

সনাতনবাবু বলেন—দেবতার নাম উচ্চারণ করলেই এ কি দেখতে পাচ্ছি বউমা। এ যে সহ্য করতে পারছি না।

কমলা ভয় পেয়ে প্রশ্ন করে—কি দেখছেন ?

ছোট বকুলের ছায়ার দিকে তাকিয়ে সনাতনবাবু বলেন—ঐযে ওখানে।

কমলা বলে—ওখানে তো কেউ নেই।

সনাতনবাবু তবু অপলক চক্ষে ছোট বকুলের ছায়ার দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলেন—তুমি ঠিক বুঝতে পারলে না বউমা।

চমকে ওঠে কমলা, সেই মুহূর্তে বুঝতে পারে, আর বুঝতে পেরেই অন্য দিকে চোখ ঘুরিয়ে নেয়। আর সনাতনবাবু, যিনি এত বোঝেন, তিনি অবুঝের মত ছোট বকুলের ছায়ার দিকে লোভীর মত ; পিপাসীর মত তাকিয়ে থাকেন। নারায়ণ, নারায়ণ, প্রিয় দেবতার নাম উচ্চারণ করা মাত্র দেবতার মূর্তি যেন ঐখানেই কোথাও লুকিয়ে পড়ছে।

না, ঠিক লুকিয়ে পড়ে না। তাই ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে থাকেন সনাতনবাবু। আর বোধহয় দেখতেও পান, তাঁর প্রিয় দেবতা শঙ্খ চক্র গদা ও পদ্ম হারিয়ে সংসারের একটা তিন বছর বয়সের শিশু হয়ে ছোট বকুলের ছায়ায় বসে ধুলো ঘাঁটছে।

## স্বমহিমচ্ছায়া

দেশী মানুষ হয়ে বিলাতী সদাগরী অফিসের ছোট সাহেব হওয়া সাধারণ ব্যাপার নয়। আজ পর্যন্ত ক'জনই বা এরকম অসাধারণ প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন?

পেয়েছেন নিখিল মিত্র। যাঁরা বিশেষ কিছু খবর রাখেন না, তাঁরাই শুধু ভেবে আশ্চর্য হন, কেমন করে নিখিল মিত্রের মত এত সাধারণ বিদ্যার মানুষ এরকম অসাধারণ একটা পদের অধিকার পেয়ে বসলেন। অফিসটাও নিতান্ত সাধারণ রকম কারবারের অফিস নয়। একদিক থেকে পাট গালা আর অভ্রের রপ্তানি, আর ওদিক থেকে ইস্পাত ও নানা কেমিক্যালের আমদানি। অফিসের বড়-বড় ঘরের বড়-বড় আলমারিতে বড় বড় ফাইলের স্তূপ দেখেই বোঝা যায়, এই অফিস বছরে কয়েক কোটি টাকার হিসাব নাড়াচাড়া করে। সেই সঙ্গে উঠে বসে আর নড়চড় করে বেড়ায় কয়েক শত মানুষের জীবিকা। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, সুপারভাইজর, ইন্‌স্পেক্টর, ক্লার্ক, টাইপিস্ট, পিয়ন, বেয়ারা আর চাপরাসি। এতগুলি মানুষের জীবনের উপরেই করুণা করবার, ভাল করবার, এবং এমন কি ইচ্ছে করলে ক্ষতিও করবার ক্ষমতা নিশ্চয়ই আছে তার, যাঁর নাম নিখিল মিত্র, যিনি এই সদাগরী অফিসের ছোট সাহেব।

যাঁরা কিছু কিছু খবর রাখেন, তাঁরা জানেন, নিখিল মিত্র ভাগ্যের জোরে এই অফিসের ছোট সাহেব হয়েছেন। একচল্লিশ বছর ধরে এই অফিসেরই বড় বাবু ছিলেন যিনি তিনি ছিলেন নিখিল মিত্রেরই কাকা। ভাই-পো'র ভাল করবার জন্য অনেক চিন্তা করতেন কাকা। এবং মারা যাবার আগের দিন রোগশয্যা থেকে চিঠি লিখে বড় সাহেব আর ডিরেক্টরদের কাছে শেষ অনুরোধ জানিয়েছিলেন, তাঁর ভাই-পো নিখিল মিত্রকে যেন বিশেষ অনুগ্রহ করে বিশেষ একটা ভাল পোস্ট দেওয়া হয়। একচল্লিশ বছর ধরে অনেক নিষ্ঠা পরিশ্রম আর সুপরামর্শ দিয়ে এই সদাগরী কোম্পানীর অনেক উন্নতি ঘটিয়েছিলেন যিনি, তাঁর শেষ অনুরোধের সম্মান তুচ্ছ করেননি কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ড, এবং বড় সাহেবও। সাধারণ বিদ্যার মানুষ যে

নিখিল মিত্র একটা অতি সাধারণ চাকরির ভরসাও ছেড়ে দিয়ে, আর নিজেরই সম্পর্কে বড় বেশি হতাশ হয়ে ঘরে বসেছিলেন, সেই নিখিল মিত্রই অকস্মাৎ একদিন লণ্ডনগামী জাহাজে উঠে বসলেন। অনুগ্রহ করেছে কাকার কাছে কৃতজ্ঞ কোম্পানী। এক বছরের মত কোম্পানীর লণ্ডন অফিসে থেকে আর কিছু কিছু কাজের শিক্ষাদীক্ষা নিয়ে কলকাতায় ফিরে এলেন নিখিল মিত্র। সেই থেকে তিনি কোম্পানীর কলকাতা অফিসের ছোট সাহেব।

যেদিন ছোট-সাহেব হয়ে এই অফিসের ঐ কামরার ঐ চেয়ারটিতে প্রথম বসেছিলেন নিখিল মিত্র, সেদিন তিনি মনে মনে তাঁর ভাগ্যকেই ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন। কাকার স্নেহের কথা মনে করে চোখ ছলছলও করে উঠেছিল, এবং সেই সঙ্গে নিজেরই উপর খুশী হয়ে উঠেছিলেন। এক বছর আগেও নিজের সম্বন্ধে যিনি হতাশ হয়েছিলেন, তিনি তাঁর ছোট-সাহেবী জীবনের প্রথম দিনে প্রথম ঘটনাতেই নিজের উপর যে শ্রদ্ধা বোধ করে ফেললেন, সেই শ্রদ্ধা আজও তাঁর প্রতিক্ষণের চিন্তার মধ্যে সজাগ হয়ে রয়েছে। বাইশ বছরের পুরনো সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ভাদুড়ি মশাই নিখিল মিত্রের কামরার ভিতরে ঢুকেই মাথা হেঁট করে আর হাত তুলে অভিবাদন জানিয়েছিলেন। যাবার সময়ও হেঁট মাথা তুলিয়ে আর যে-আজ্ঞে-স্যার বলে চলে গিয়েছিলেন ভাদুড়ি মশাই। সেই মুহূর্তে নিজেকেই নতুন করে চিনতে আর বুঝতে পেরেছিলেন নিখিল মিত্র। তাঁর ভাগ্য অসাধারণ, তাই তিনিও অসাধারণ। নিজেকে অসাধারণ বলে সত্যিই মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেছিলেন। হঠাৎ অ্যাকাউণ্টেণ্টের ঘরের ভিতরে গিয়ে দাঁড়াতেই আর একটা দৃশ্য দেখতে পেয়েছিলেন নিখিল মিত্র। ঘরের সব মানুষ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। অত্যন্ত সৌজন্যের সঙ্গে এবং নম্রস্বরে কথা বলেছিলেন নিখিল মিত্র—বসুন, বসুন, সবাই বসুন।

এভাবে সৌজন্য প্রকাশ করতেও যে এত আনন্দ আছে, আগে কল্পনাও করতে পারেননি নিখিল মিত্র। তার মুখের একটা সামান্য কথা, কিন্তু তারই মধ্যে কত বড় আদেশের শক্তি! সত্যিই তাঁর কথার ইঙ্গিতে এতগুলি মানুষের জীবন উঠছে আর বসছে।

লক্ষ্য করলেন নিখিল মিত্র, তার এত সরল ও উদার সৌজন্যের নির্দেশ শুনেও এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়েই রইলেন। ভদ্রলোকের চোখে কেমন যেন

বিনীত ও লজ্জিত একটা কুণ্ঠার ভাব। ছোট-সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন, তাই বোধহয় চেয়ারে বসতে পারছেন না ভদ্রলোক।

—আপনি বসুন। ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে কথা বললেন নিখিল মিত্র। ভদ্রলোক কাঁচুমাচু হয়ে বললেন—বসছি স্যার। কিন্তু বসলেন না। যেন ছোটসাহেবের অসাধারণ মর্যাদা কিছুতেই ভুলতে পারছেন না সেই ভদ্রলোক, যাঁর নাম নিতাইবাবু, এই ঘরের টাইপিষ্ট।

নিতাইবাবুর এই অতিবিনীত ভঙ্গীটিকেও দেখতে ভাল লাগে নিখিল মিত্রের। নিখিল মিত্রেরই সৌজন্যের অনুরোধ অমান্য করে টাইপিষ্ট নিতাইবাবু যেন পৃথিবীর এই নতুন সত্যকে অত্যন্ত স্পষ্ট করে ঘোষণা করছে, নিখিল মিত্র কত অসাধারণ। কত বড় সম্মানের আস্পদ। টাইপিষ্ট নিতাই-বাবুকে বড়ই ভালমানুষ বলে মনে হয়, আর সকলের চেয়ে নিতাইবাবুকেই দেখতে একটু বেশি ভাল লাগে।

বোধহয় ছোট-সাহেবী জীবনের প্রথম দিনেই এই ধরণের কয়েকটা ঘটনার পর নিখিল মিত্রের ধারণা অনুভব আর বিশ্বাসের জগতে ছোট-খাট একটা বিপ্লব ঘটে গিয়েছিল। অফিস ঘরের এতগুলি হেঁট-মাথা মূর্তি যেন তাঁর জীবনেরই কৃতিত্বের প্রত্যক্ষ স্বীকৃতি। এই সম্মান, এই ক্ষমতা, আর এই দায়িত্ব, এই সবই কি নিতান্ত ভাগ্যের দান? না, ভাগ্যের অনুগ্রহ তাঁকে কৃতী করে তুলেছে, একথা ঠিক কথা নয়। তিনি কৃতী বলেই ভাগ্য তাঁকে অনুগ্রহ করেছে। নইলে ইকনমিক্সের ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট এম-এ ঐ সলিল সেনের জীবনে এরকম একটা ভাগ্যের অনুগ্রহ ঘটে না কেন? যে সলিলের কথা মনে পড়তে আগে বেশ একটু শ্রদ্ধাই জাগতো নিখিল মিত্রের মনে, আজ মনে শুধু জাগে একটু দুঃখ আর একটু করুণা। কোন্ এক স্কুলের টীচার হয়েছে সলিল। নিখিল মিত্র কল্পনা করেন, সলিলের একটু উপকার করলে কেমন হয়? এই অফিসেই সিনিয়র গ্রেডের কোন একটা কেরাণীর পোস্টে সলিলকে বসিয়ে দিতে পারলে সলিল নিশ্চয়ই নিখিলের কাছে আজীবন কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবে।

যাই হোক, যদিও একটা বছর পার হয়ে গিয়েছে, কিন্তু আজও কলেজ-বন্ধু সলিল সেনের কোন উপকার করে উঠতে পারেননি নিখিল মিত্র। মনে হয়েছে, সলিলের ডিপ্লোমাই সার, ভিতরে অসার, মাথা ঘামাবার কোন কাজেরই যোগ্য নয় সলিল। এক বছর ধরে নিজের এই অসাধারণ কৃতী

জীবনের সত্যতাকেই শুধু অনুভব করেছে নিখিল মিত্র এবং সেই অনুভব মনে এক সুন্দর বিশ্বাস হয়ে উঠেছে।

নিখিল মিত্রের এই সুন্দর বিশ্বাস একেবারে ধন্য হয়ে যায় এই পৃথিবীরই বিশেষ এক জনের দুটি সুন্দর হর্ষদীপ্ত চক্ষুর কাছে। নিখিল মিত্রের স্ত্রী মীরা মিত্র যখন মুগ্ধ হয়ে নিখিল মিত্রের কৃতী জীবনের প্রাত্যহিক ঘটনার গল্পগুলি নিখিল মিত্রেরই মুখ থেকে শুনতে শুনতে মুগ্ধ হয়ে যান, তখন মনে হয় নিখিল মিত্রের তাঁর অসাধারণ কৃতী জীবনের স্বীকৃতি যেন এতক্ষণে পূর্ণ হয়ে উঠলো।

মীরা মিত্র হলেন তেমনই এক সাধারনী নারী, যিনি স্বামীর প্রতিষ্ঠায় নিজেরই জীবনের প্রতিষ্ঠা এবং স্বামীর সম্মানে নিজেরই সম্মান স্বীকার করেন, এবং বিশ্বাসও করেন। স্বামীর কৃতিত্বের মধ্যে নিজেরই জীবনের গর্ব অনুভব করার মত মন আছে, আগ্রহও আছে মীরা মিত্রের।

—আসছে পূজার বোনাসের জন্য কলকাতা অফিসের স্টাফের প্রায় সাড়ে তিন'শ মানুষ আমার মুখের দিকে আশা করে তাকিয়ে আছে।

মীরা মিত্রের দিকে তাকিয়ে একথা বলতে অদ্ভুত একটা উদারতার মহিমা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে নিখিল মিত্রের দুই চোখে। মীরা মিত্র বলেন—তুমিই তো ওদের একমাত্র ভরসা। তোমাকেই তো এসব ভাবতে হবে,তুমি ছাড়া ওদের উপকার করবার আর আছেই বা কে? বলতে গিয়ে মীরা মিত্রের দুই চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

নিখিল মিত্রের আনন্দ হলো মীরা মিত্রের দুই চোখের ঐ উজ্জ্বলতাটুকু, মীরা মিত্রের কথাগুলির অর্থটুকু নয়। নিখিল মিত্রের ক্ষমতা, প্রতিষ্ঠা, অধিকার ও কৃতিত্বের গৌরব মীরা মিত্রের ঐ বিশ্বাসভরা ও সপ্রশংস দুই দৃষ্টির মধ্যে ঝকঝক করছে।

অফিসে এবং ঘরে, দুই ভিন্ন জগতের ক্রোড়ে নিখিল মিত্রের কৃতী জীবনের গৌরব এইভাবেই মানুষের সপ্রশংস দৃষ্টির অভিনন্দনে স্বীকৃত হয়ে রয়েছে। অফিসে টাইপিস্ট নিতাইবাবু, এবং এঁরই মত আরও অনেক জন। আর ঘরে স্ত্রী মীরা মিত্র। তবে পার্থক্য আছে। অফিসের সপ্রশংস ও বিনীত দৃষ্টিগুলির মধ্যে যেন একটা ভঙ্গী আছে। নিখিল মিত্রের বুদ্ধি অন্ধ নয়, এবং বুঝতে পারে যে, টাইপিস্ট নিতাইবাবু ও তাঁর মত আরও অনেকে নিখিল মিত্রের ছোটসাহেবী জীবনকে একটি অসাধারণ কৃতিত্বের জীবন বলে

বিশ্বাস করুক বা না করুক, অন্ততঃ বিশ্বাসের ভঙ্গী দিয়ে স্বীকার করে নিচ্ছে। একটু খাদ, সামান্য একটু ভেজাল নিশ্চয়ই আছে অফিসের এইসব সুবিনীত ভঙ্গীগুলির মধ্যে। থাকুক, তবুও দেখতে ভাল লাগে। কিন্তু সব-চেয়ে ভাল দেখতে মীরা মিত্রেরই দুটি স্মিত চক্ষুর সপ্রশংস দৃষ্টি। ওর মধ্যে কোন ভেজাল নেই। মীরা মিত্রের ঐ দৃষ্টি বিশ্বাসের ভঙ্গী নয়, ওটা বিশ্বাস। তাইতো প্রতিক্ষণ, ছোটসাহেবী জীবনের প্রতিদিনের নানা তুচ্ছ ঘটনার গল্প মীরা মিত্রের কাছে বর্ণনা করে করে নিখিল মিত্রের জীবনের প্রতিটি সন্ধ্যাই তৃপ্ত হয়।

ভালই ছিলেন নিখিল মিত্র, কিন্তু টাইপিস্ট নিতাইবাবুই একদিন একটা অদ্ভুত খবর শুনিয়ে নিখিল মিত্রের মনের মধ্যে কেমন যেন একটা অস্বস্তি ছড়িয়ে চলে গেলেন। আর একজন টাইপিস্ট, নিতান্ত সি গ্রেডের মানুষ, যাঁর নাম হরেন নিয়োগী, যিনি অ্যাকাউন্টস দপ্তরেরই এক কোণে বসে থাকেন, সেই হরেন নিয়োগী নাকি অফিসে বসেই মোটা মোটা বই পড়েন। একটা বই-এর নামও বলে দিয়ে গেলেন নিতাইবাবু, ফিলসফির বই। সেই মুহূর্তে অর্ডার লিখলেন নিখিল মিত্র, অফিসে বসে কেউ যেন বাইরের বই না পড়ে।

তার পরের দিনই হরেন নিয়োগীর টেবিলের কাছে এসে দাঁড়িয়ে লোকটিকে ভাল করে দেখলেন নিখিল মিত্র। ছোটসাহেবকে দেখে হরেন নিয়োগী উঠে দাঁড়ালেন, বসতে বলা মাত্র বসে পড়লেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে টাইপ করে যেতে লাগলেন। বিনীত ভঙ্গী নেই, অবিনীত ভঙ্গীও নেই। লোকটা বিশেষ ভদ্রও নয়, অভদ্রও নয়। যেন একটা নিরেট ও নিখুঁত কর্তব্যের যন্ত্র।

সারা অফিসের মধ্যে এই প্রথম একটি মানুষকে দেখলেন নিখিল মিত্র, যাকে দেখলে মন অপ্রসন্ন হয়। অফিসের মধ্যেই ঘুরে ফিরে নানা প্রসঙ্গের কথা বলতে থাকেন নিখিল মিত্র। ছোটসাহেবের ভাষণ সকলেই মুগ্ধ হয়ে শুনতে থাকে, এবং সকলেই কিছুক্ষণের জন্য কলম থামিয়ে রাখে। শুধু হরেন নিয়োগীর টাইপরাইটার অক্লান্ত ও একঘেয়ে শব্দে বাজতে থাকে। ছোটসাহেব নিখিল মিত্র হাত তুলে ইঙ্গিতে হরেন নিয়োগীকে থামতে বলেন। একবার হাসেন নিখিল মিত্র, তারপর প্রায় চেঁচিয়ে বলতে থাকেন,

—আপনারা পড়েছেন আজকের কাগজে, দেশবিখ্যাত দার্শনিক শাস্ত্র মশাই-এর বক্তৃতা ?

কেউ কেউ বলেন—হ্যাঁ স্যার।

নিখিল মিত্র বলেন—কিন্তু ওগুলি কি বক্তৃতা না উজবুগের প্রলাপ ?

অফিসের চেয়ারে চেয়ারে সমাসীন এক একটি বিনীত মূর্তির মুখে হাসির উচ্ছ্বাস মুখর হয়ে ওঠে। টাইপিস্ট নিতাইবাবু বলেন—আপনি ঠিক বলেছেন স্যার।

দেখতে পেলেন নিখিল মিত্র, সি গ্রেডের সেই মানুষটা, সেই টাইপিস্ট হরেন নিয়োগীর মুখটা চাবুক-খাওয়া জন্তুর মুখের মতন দেখাচ্ছে। যেন একটা দুঃসহ যন্ত্রণা অসহায়ের মত মুখ বুজে সহ্য করছে লোকটা। ঠিক হয়েছে, বেশ হয়েছে। যা চেয়েছিলেন নিখিল মিত্র, তাই হয়েছে। খুশী হয়ে ঘর ছেড়ে অন্য ঘরের কাজের জীবন দেখতে চলে যান নিখিল মিত্র।

কিন্তু এই খুশীর জের বেশিদিন রইল না। একটা সংবাদ এনে নিখিল মিত্রের মনে আবার একটা কাঁটার খোঁচা বিঁধিয়ে দিয়ে গেলেন নিতাইবাবু। হরেন নিয়োগীর একটা লেখা বের হয়েছে এক পত্রিকায়। ইংরেজী কবিতা সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ।

চমকে উঠলেন, এবং একটু পরেই সি গ্রেডের মানুষ সেই হরেন নিয়োগীর টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালেন নিখিল মিত্র। তার পরেই কাশলেন এবং একটু হাসলেন। পাইচারী করলেন কিছুক্ষণ, তারপর ঘরসুদ্ধ মানুষকেই যেন প্রশ্ন করলেন—আপনাদের কারও মনের মধ্যে কি কোন বাতিক আছে, কোন বাজে বাতিক, আই মীন, এইসব কবিতা-টবিতা সাহিত্য টাহিত্য ?

নিতাইবাবু বলেন—আমরা কাজের মানুষ স্যার, ওসব বাজে বাতিক আমাদের নেই

নিখিল মিত্র বলেন—তবে শুনুন, এই ক'দিন আগে আপনাদের দেশের এক নামকরা কবি এসেছিলেন আমার কাছে, বললেন চাকরি চাই। পরীক্ষা করে দেখলুম, একটি আস্ত গবেট। কোন কাজেরই যোগ্য নয়।

হরেন নিয়োগীর মুখটা আবার চাবুকখাওয়া জন্তুর মুখের মত দেখায়। নিখিল মিত্র খুশী হয়ে চলে যান।

কিন্তু আবার এই খুশীর জের বেশী দিন মনের মধ্যে থাকবার সুযোগ পায়

না। আবার আসেন নিতাইবাবু, এবং চুপে চুপে হরেন নিয়োগীর আর একটা গোপন অপরাধের সংবাদ শুনিয়ে যান। হরেন নিয়োগী আজকাল বন্যা-পীড়িতের জন্য চাঁদা যোগাড় করছে। সেদিন আবার জানা গেল, হরেন নিয়োগী কোন এক দাতব্য লাইব্রেরী কমিটির প্রেসিডেন্ট হয়েছে।

ভাবতে ভাবতে আশ্চর্য হয়ে যান নিখিল মিত্র। হরেন নিয়োগী ঐ বাজে লোকটা যেন ইচ্ছে করে মানুষকে জ্বালাবার জন্য মহাপুরুষ-মহাপুরুষ খেলা খেলছে। মানুষটা যদি এতই গুণের মানুষ হয়ে থাকে, তবে এখানে থি গ্রেডের জীব হয়ে পড়ে থাকে কেন? লোকটার কথা মনে পড়তেই নিখিল মিত্রের মনের সব বিশ্বাসের মধুরতাগুলিই যেন তিক্ত হয়ে ওঠে। লোকটাকে বড় বেশী উদ্ধত আর অহংকারী বলে মনে হয়। অত্যন্ত বাধ্যভাবে এবং নিয়মমত কাজ করে চলে যায় হরেন নিয়োগী, এই নিখুঁত বাধ্যতাও যেন একটা বেপরোয়া অহংকার। কাজেও কোন ভুল হয় না। ছোটসাহেব দয়া করে ভুল ক্ষমা করে দেবেন, এই সুযোগ থেকেও নিখিল মিত্রকে বঞ্চিত রেখেছে হরেন নিয়োগী। কিন্তু ভুল কি করবে না কোনদিন?

হ্যাঁ, একদিন ভুল করলেন হরেন নিয়োগী, এবং নিখিল মিত্রের মনও প্রসন্ন হয়ে উঠলো। দু'দিন কাজে অনুপস্থিত হয়েছেন হরেন টাইপিস্ট এবং তৃতীয় দিনেও হরেন নিয়োগীর কোন ছুটি প্রার্থনার দরখাস্ত এল না। তার চেয়ে আরও ভাল, নিতাইবাবু খবর জানিয়ে গেলেন, এবং ছোট সাহেব নিখিল মিত্র জানলেন, নানা জায়গায় গানের আসরে গান গেয়ে বেড়াচ্ছেন হরেন নিয়োগী।

আশ্চর্য হন নিখিল মিত্র—কি আশ্চর্য, লোকটা গানও গাইতে পারে না কি?

নিতাইবাবু বলেন—ভয়ানক গাইতে পারে স্যার। কিন্তু আপনি কি এইভাবে বার বার ওকে ক্ষমা করতে থাকবেন স্যার?

ছোটসাহেব নিখিল মিত্রের মুখ কঠোর হয়ে ওঠে।—আমি কালই ওকে সসপেণ্ড করবো!

সন্ধ্যায় পার্কে বেড়িয়ে বাড়ি ফিরছিলেন নিখিল মিত্র। সঙ্গে মীরা মিত্র। অফিসের গল্পই করছিলেন নিখিল মিত্র, এবং তাঁর ছোটসাহেবী

জীবনের নানা খুঁটিনাটি গর্বের, কৃতিত্বের ও সম্মানের নানা ঘটনার গল্প, তেমনি মুগ্ধ হয়ে শুনেছিলেন স্বামীর সুখে সুখিনী মীরা মিত্র।

পার্কের গেট থেকে বের হয়ে ডাইনের ছোট রাস্তা দিয়ে একটু এগিয়ে যেতেই অকস্মাৎ থমকে দাঁড়ালেন মীরা মিত্র। নিখিল মিত্রও থামলেন।

একটু দূরে ছোট মাঠের উপর সামিয়ানার নীচে আলো-ছড়ানো একটা আসর। চারিদিকে ঘন জনতার ঠাসাঠাসি একটা বৃত্ত। দূরের আসর থেকে এক মুঠো আলোর ঝলক এসে লুটিয়ে পড়েছে মীরা মিত্রের মুগ্ধ ও বিস্মিত দুটি চোখের উপর। কিন্তু এই বিস্ময় আলো-দেখা মুগ্ধতার বিস্ময় নয়, মীরা মিত্রের দুই কান মুগ্ধ হয়ে শুনছে একটা গানের সুর। কবীরের ভজন গাইছেন কোন্ এক গুণী।

মীরা মিত্র বলেন—এই ভজনটা আমি অনেকের মুখে অনেকবার শুনেছি, কিন্তু শুনতে এত ভাল কোন দিন লাগেনি।

একটু চুপ করে থেকে মীরা মিত্র বলেন—চল, কাছে গিয়ে শুনেই আসি।

জীবনে এভাবে অপ্রস্তুত হবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না নিখিল মিত্র। কিন্তু আসরের কাছে এগিয়ে যেতেই যেন হঠাৎ আহত মানুষের মত পা টলে উঠলো নিখিল মিত্রের। একটা ভাবেননি নিখিল মিত্র, কিন্তু একেবারে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, তাই সত্য হয়েছে। আসরের মাঝখানে বসে গান গাইছে সেই সি গ্রেডের মানুষটা, টাইপিস্ট হরেন নিয়োগী। কাজ ফাঁকি দিয়ে সরে রয়েছে যে লোকটা, যাকে কালই সসপেণ্ড করতে হবে।

দৃশ্যটা নানা কারণেই দুঃসহ। হরেন নিয়োগী যেন বিশ্বসংসারের রঙ্গ-মঞ্চে এক মহামহিম সম্মানের সিংহাসনে বসে রয়েছে। চারিদিকে শত শত মুগ্ধ চক্ষুর অভিনন্দন। আসরের সামনের দিকে চেয়ারের উপরে যাঁরা বসে রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে একজনকে চিনতে পারলেন নিখিল মিত্র। রেল-ওয়ের জনার্দন সান্যাল, যিনি যে-সে মানুষ নন, যাঁর অফিসারী গৌরব নিখিল মিত্রের সদাগরী অফিসের ছোট-সাহেবী গৌরবের চেয়ে অনেক বড়। কি ভয়ানক বিশ্রীভাবে মাথা দুলিয়ে জনার্দন সান্যাল বারবার সাধুবাদ জানাচ্ছেন ভজন-মুখর ঐ হরেন নিয়োগীকে!

আরও আশ্চর্য করলেন স্বয়ং মীরা মিত্র। আসরের উদ্যোক্তাদের একজন এগিয়ে এসে অনুরোধ করতেই মীরা মিত্র এগিয়ে গেলেন, এবং একটি চেয়ারের উপর বসে পড়লেন। পিছনের দিকে, কিংবা পাশের নিখিল

মিত্রের দিকে একবার তাকিয়ে দেখতেও ভুলে গেলেন মীরা মিত্র। মীরা মিত্র যেন বাঁশির স্বরে মুগ্ধ হরিণীর মতই সব ভুলে ছুটে চলে গেলেন আসরের ভিতরে।

হরেন নিয়োগীর গান আসরের বাতাসকে মধুময় করে তুলেছে। চারদিকের জনতার চোখের মুগ্ধতা আর মুখের উল্লাসও যেন ভিন্ন জগতের এক কৃতীর মহিমাকে অতি কঠোর এক সম্মানের কবচ দিয়ে রক্ষা করে রেখেছে। ওদিকে এগিয়ে যাবার যেন কোন অধিকার নেই ক্ষমতা নেই, সাহসও হয় না নিখিল মিত্রের। নিখিল মিত্র শুধু ছায়ার মত মাঠের ফাঁকার মধ্যে পাইচারী করে বেড়াতে থাকেন। নিখিল মিত্রের মুখটা চাবুক-খাওয়া জীবের মতই যন্ত্রণাক্ত হয়ে উঠে।

আর কতক্ষণ? কতক্ষণে শেষ হবে ঐ গান? ঠিকই বলেছে নিতাই টাইপিস্ট, লোকটা ভয়ানক গাইতে পারে।

হরেন নিয়োগীর গান শেষ হয়। মীরা মিত্রও উঠে আসেন, এবং আসরের বাইরে এসে নিখিল মিত্রকে দেখতে পেয়েই আক্ষেপ করেন।—এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কেন মিছামিছি সময় নষ্ট করলে?

নিখিল মিত্র প্রশ্ন করেন—তার মানে?

মীরা মিত্র বলেন—কাছে গিয়ে শুনলে বুঝতে পারতে, কি সুন্দর গাইলেন ভদ্রলোক।

পথ চলতে থাকেন দু'জনে। নিখিল মিত্র বলেন।—যে লোকটা গাইল, তাকে তুমি চেন না নিশ্চয়।

মীরা মিত্র বলেন—আমি চিনব কেমন করে? তুমি চেন বোধ হয়।

নিখিল মিত্র বলেন—চিনি। লোকটা আমার অ্যাকাউন্টেন্টের আণ্ডারেই কাজ করে।

মীরা মিত্র বিস্মিত হয়, যেন ভয়ানক এক বিস্ময়।—কি আশ্চর্য!

চমকে ওঠেন নিখিল মিত্র। মীরার বিস্ময় যেন নিখিল মিত্রের এতদিনের বিশ্বাসের জগৎটাকেই নিষ্ঠুর খোঁচা দিয়ে শিশুর তুচ্ছ বিশ্বাসের ক্রীড়নকের মত অনায়াসে একেবারে উল্টে দিয়েছে। মীরা মিত্রের বিস্ময় যেন বলতে চায়, হরেন নিয়োগীর মত মানুষ পৃথিবীর অতি সাধারণ একটা সদাগরী অফিসের চেয়ারের অধীন কেন? হরেন নিয়োগীর মত মানুষের

জীবনের গৌরব যে এই সন্ধ্যার আকাশে বাতাসে মধুর সুরের ঝংকার হয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে।

বাড়িতে ঢুকবার সময় আরও আশ্চর্য করলেন মীরা মিত্র। বললেন—ভালই হলো। পুঁটুর জন্মদিনে ভদ্রলোককে নেমন্তন্ন করো, আরও ভাল গান শোনা যাবে।

বাড়ির সামনে একটা ঝাউ। চেয়ারে বসে ঝাউয়ের দিকে তাকাতেই দেখতে পেলেন নিখিল মিত্র, এক ফালি চাঁদ উঠেছে আকাশে। শিকল-খোলা হাউণ্ডও অকারণে ছুটোছুটি করছে, আর আকাশের দিকে তাকিয়ে ঘেউ ঘেউ করছে।

বার বার কাশলেন নিখিল মিত্র। মনে পড়ে অফিসের টেবিলে সেই সোনা-বাঁধানো কলমটার চেহারা। কালই হরেন নিয়োগীকে সসপেণ্ড করার কথা। ঐ কলমেই সসপেণ্ড করার অর্ডার লিখতে হবে।

কিন্তু সেই অর্ডার লিখতে পারা যাবে তো? কেমন যেন মনে হয়, নিখিল মিত্রের মনের ভিতর প্রতিজ্ঞাটা যেন ভয়ে ভয়ে মুখ লুকিয়ে ফেলেছে, নেতিয়ে পড়ছে। ছোটসাহেবের সোনাবাঁধানো কলমটার মেরুদণ্ডই বোধ হয় ভেঙ্গে গিয়েছে।

## মিথ্যা মা

ঠাকুরপুরের রাজবাড়ি, অর্থাৎ সেই বিখ্যাত ঠাকুরপুর জমিদারীর তিন-আনি শরিক অজিত রায়চৌধুরীর বাড়ি। রাজবাড়ি নামটা এখন প্রায় অচল হয়ে এসেছে। আর ক'দিন পরে হয়ত একেবারে লুপ্ত হয়েই যাবে। শুধু আশেপাশের দু'-চার গ্রামের অতিবৃদ্ধ এবং চাষাভূসো মানুষ ছাড়া আজ আর কেউ ঐ বাড়িকে রাজবাড়ি বলে না।

সদর শহরের মধ্যে নয়, একটু দূরে, শহুরে জীবন এবং গেঁয়ো জীবনের মাঝামাঝি অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে তিনপুরুষ আগের এই রাজবাড়ি। সদরের আদালতে ওকালতি করেন অজিত রায়চৌধুরী। প্রবীণ উকীল অজিতবাবুর পশারও এতদিনে বেশ প্রবীণ হয়ে উঠেছে। রাজবাড়ি নামটা ক্রমে ক্রমে জীর্ণ হয়ে উঠতেই উকীলবাড়ি নামটা বেশ প্রবল ও মুখর হয়ে উঠছিল, এবং এই নামটাই পাকা হয়ে যেত নিশ্চয়, কিন্তু হতে পারেনি। ঠাকুরপুরের ছেলেমেয়েদের ভাষায় নতুন একটা আখ্যা সব চেয়ে বেশি মুখর হয়ে পুরনো নামগুলিকে চাপা দিয়ে একেবারে নীরব করে দিয়েছে। ঐ নাম এখন জয়া মায়ের বাড়ি।

এই বাড়ির বড় ছেলে মানিক, অজিতবাবুর ছেলে নয়। মানিক হলো অজিতবাবুর স্ত্রী জয়া দেবীর বড়দির সেজ ছেলে। মানিকের মুখের ভাষাটাই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে। জয়া মাসীকে জয়া-মা বলে ডাকে মানিক। তাই ঠাকুরপুরের সব ছেলেমেয়ের কাছে, এবং সদরের কাছে এই বাড়ি জয়া মায়ের বাড়ি হয়ে গিয়েছে। কে না চেনে মানিককে? অতি ভাল ছাত্র, এবং খেলতে পারেও কত ভাল, সেই মানিক তার যে জয়া-মায়ের বাড়িতে থাকে, সেই জয়া-মায়ের নামের গৌরবই আজ প্রাচীন রাজবাড়ি আর কিছুকালের উকীলবাড়ি নামের গৌরব ছাপিয়ে গিয়েছে।

জয়া-মায়ের নামে যে-সব গল্প আর সংবাদ আজ প্রায় বাইশ বছর ধরে ঠাকুরপুরে, আশে-পাশের গাঁয়ে, আর সদর শহরেরও মনে মনে স্মৃতি হয়ে রয়েছে, সেই সব গল্প আর সংবাদের গৌরবই জয়ী হয়েছে বলা যায়। সে এক আশ্চর্য মনের ইতিহাস। পরের ছেলেকে সত্যিই খাঁটি মায়ের-মন দিয়ে

নিজেরই সন্তানের মত আপন করে নিতে পেরেছে, এমনই এক নারী-জীবনের আগ্রহের ইতিহাস।

এই বাড়িতে যেদিন বধূবেশে প্রথম এসেছিলেন জয়া দেবী, সেই দিনটি হলো আজ থেকে ত্রিশ বছরেরও বেশি অতীতের একটি দিন। শান্তি ছিল, আনন্দও ছিল, কিন্তু একটি শূন্যতাও যেন অদেখা স্বপ্নের মত এই বাড়ির জীবনের সব চঞ্চলতার মধ্যে মুখ লুকিয়ে থাকতো। আত্মীয়-স্বজনেরা চিন্তান্বিত হয়েছিলেন, এবং অজিতবাবুও মাঝে মাঝে কি-যেন ভাবতেন। বছরের পর বছর পার হয়, তবু কোন শিশুর কলরব জাগে না কেন এই বাড়ির বাতাসে? চিঠি-পত্রে অনেক স্বজনের কাছ থেকে অনেক উপদেশ আসতো, জয়া একটা মানত করুক। নইলে এত বড় বাড়ির এই ফাঁকা ফাঁকা আর নেড়া-নেড়া ভাব ঘুচবে না। জয়ার কোল ভরে না উঠলে এই বাড়ির বুকের শূন্যতাও ভরে উঠবে না।

অজিতবাবু গম্ভীর হয়ে কি যেন ভাবতেন, কিন্তু জয়া হেসে ফেলতেন। মানত করতে হবে কেন? দরকারই বা কি? একেবারে স্পষ্ট করে এবং অদ্ভুত ও তীব্র এক আগ্রহের ছোঁয়ায় যেন ছটফট করে জয়া বলে ফেলতেন একটা কথা, আর শুনে চমকে উঠতেন অজিতবাবু। জয়া বলতেন—যেখান থেকে পার একটা বাচ্চাকে নিয়ে এসে ফেলে দাও না আমার কাছে।

নীরব ও নিরুত্তর অজিতবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে জয়া তেমনি অতি সহজে অবাধে আর স্বচ্ছন্দে হেসে হেসে বলতেন—কোন জ্বালা-যন্ত্রণার দুর্ভোগ ভুগতে হবে না, অথচ একটা ছেলে চলে এল কোলে। এই তো ভাল।

অজিতবাবু হাসেন—তা না হয় হলো, কিন্তু···।

—কিন্তু আবার কি?

—তুমি কি সত্যিই মায়ের মন নিয়ে পরের ছেলেকে মানুষ করতে পারবে?

—কেন পারবো না?

—হয় না জয়া, তাতে পরের ছেলেকে শুধু মানুষ করা হয়, কিন্তু মায়ের-মনের আনন্দ পাওয়া যায় না।

জয়া বলেন—খুব হয়, খুব পাওয়া যায়।

শেষ পর্যন্ত জয়ারই এই অবাধ হাসির আগ্রহ সত্য হয়ে উঠলো, সে সত্য আজ এই বাড়ির জীবনের দিকে তাকালেই দেখতে পাওয়া যায়। দেখে

মনে হয়, অজিতবাবু আর জয়াদেবী হলেন তিনটি ছেলের ও একটি মেয়ের বাপ ও মা।

বড় ছেলে মানিক হলো জয়া দেবীর বড়দির সেজ ছেলে। মেজ ছেলে তপেশ হলো জয়া দেবীর সেজ ভাসুরের ছেলে। একমাত্র মেয়ে মালতী হলো জয়া দেবীর ন'দার মেয়ে। আর সবচেয়ে ছোটটি, নিতু যার নাম, সে হলো আরও দূরসম্পর্ক এক আত্মীয়ের সংসারের এক মা-মরা ছেলে। নিতুর ভাষা অনুসারে মানিক হলো বড়দা, তপেশ মেজদা এবং মালতী হলো দিদি। বাড়ির ঝি-চাকরের কাছে অজিতবাবু আর জয়া হলেন বাবা আর মা, এবং মানিক, তপেশ মালতী আর নিতু হলো বড় খোকাবাবু, মেজ খোকাবাবু, দিদিমণি আর ছোট খোকাবাবু। এই পৃথিবীর নানা আঙিনা থেকে যেন এক একটি জ্যোৎস্না ছায়া আর শিশিরের কণা কুড়িয়ে নিয়ে এসে আপন সংসারের এক মায়াভরা আঙিনা তৈরি করে নিয়েছেন জয়া দেবী। আপন-পর সম্পর্কের নানা বিচিত্র আখ্যাগুলিও যেন এইখানে এসে এক নারীর স্নেহের কাছে সব ভিন্নতা হারিয়ে এক হয়ে গিয়েছে। জয়া হয়েছেন জয়া-মা। এই বাড়ির তিনটি ছেলে আর একটি মেয়ের কাছে এই জয়া-মা নামটিই মানুষের ভাষার মধ্যে সবচেয়ে মিষ্টি আর মায়াময় নাম। মানিক জানে, তপেশ জানে, মালতীও জানে যে, শুধুই মা নামে ওদের কেউ একজন আছেন, দূরেই আছেন, এবং চিরকাল দূরেই থাকবেন। তাঁরা আসেন মাঝে মাঝে, তাঁদের দেখতেও পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ পর্যন্ত, তার বেশি কিছু নয়। জয়া-মার চেয়ে এরা বেশি আপন-জন নয়, হতেই পারে না। তপেশের আপন মা একবার অনেক চেষ্টা করেছিলেন, পূজার সময় তপেশকে ক'দিনের জন্য নিয়ে যেতে। তপেশই গোঁ ধরে বসে রইল। পরের বাড়ি গিয়ে থাকতে ওর একটুও ইচ্ছে করে না।

মা না হয়েও এত বড় মায়ের-মনের গৌরব লাভ করেছে, এমন ব্যাপার কোথাও দেখা যায় না। প্রতিবেশীরা তাই বলে থাকেন। জয়ার নাম করতে বেশ একটু শ্রদ্ধাই অনুভব করেন ঠাকুরপুরের অনেক সত্যিকারের মা।

এপাড়া আর ওপাড়া, অনেক বাড়িতেই অনেক সময় আলোচনা হয়। বিনোদের মা বলেন—এর মধ্যে একটা কথা আছে, যা তোমরা কখনো ভেবে দেখনি।

সুধার মা বলেন—কি ?

—আগের জন্মে জয়া সত্যিই ওদের মা ছিল, নইলে পরের ছেলের জন্য এতটা কেউ করতে পারে না। মায়ের-মন কি এমনিতেই হয় ভাই !

এই সব আলোচনার কিছু কিছু কলরব মাঝে মাঝে জয়া দেবীর কানে আসে। শুনে জয়া দেবীর মনের ভিতরটাও যেন কেমন করে ওঠে। অদ্ভুত এক বিশ্বাসের বিস্ময় যেন বুকের ভিতর তৃপ্তি ছড়াতে থাকে। সত্যিই কি, মানিকটা, তপেশটা, মালতীটা আর নিতুটা আগের জন্মে তাঁরই কোলে প্রথম দেখা দিয়েছিল ? তাই নিশ্চয় ! হয়ত সেই আগের জন্মে ওদের পুরো আদর করতে পারেনি জয়া দেবী। তাই অদৃষ্ট আজ এই জন্মে ওদের আবার জয়া দেবীর কাছে এনে ফেলেছে। আশ্চর্য হয়ে ভাবেন জয়া দেবী, সত্যিই তো বড়দি আজ ছ'মাসের মধ্যেও চিঠি দিয়ে একবার খোঁজও নিলেন না কেমন আছে মানিকটা। ও ত বড়দিরই আপন ছেলে।

যাক্ গিয়ে, ওসব প্রশ্ন এখন আর জয়া দেবীর চিন্তারই প্রশ্ন নয়। দুপুরের রোদে ঝলসানো আঙিনার দিকে তাকিয়ে, বাড়ির ভিতরের বারান্দায় পাতা মাদুরের উপরে বসে জয়া দেবী চশমা-চোখে পড়ছিলেন কতগুলি চিঠি। মানিকের বিয়ের জন্য পাত্রীর পরিচয় নিয়ে এসেছে অনেক-গুলি চিঠি। বড় ছেলের বিয়ে, এই বাড়ির বউ হয়ে আসবে যে মেয়ে, সে মেয়ে যেমন-তেমন হলে চলবে না। বড়দি একটি পাত্রীর খোঁজ জানিয়েছেন। চিঠি পড়ে ক্ষুণ্ণ হলেন জয়া দেবী। নিতান্তই বাজে একটা সম্বন্ধ। বড়দি কি বুঝবেন ছাই, মানিকের সঙ্গে কেমন মেয়েকে মানাবে ভাল ? বড়দি শুধু নামেই মা।

—মা, ওগো মা।

অদ্ভুত একটা ডাক। বাড়ির বাইরের বারান্দার দিক থেকে ভেসে আসছে এই আহ্বানের স্বর ! ভিখিরীর গলার স্বর তো এরকম নয়। যেন অনেকদিন পরে দূর থেকে ঘরে এসে ব্যস্তভাবে কেউ তার মা'কে ডাকছে। —মা, ওগো মা !

মাদুর ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন জয়া দেবী। ধীরে ধীরে হেঁটে এসে বাইরের বারান্দার উপর দাঁড়ালেন। দেখে আশ্চর্য হলেন। সত্যিই ভিক্ষুক টিক্ষুক নয়। বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে, মানিকের চেয়ে কিছু বড়, রোগা চেহারার একটা লোক বারান্দার সিঁড়ির শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে রয়েছে। নোংরা একটা

গেঞ্জি গায়ে, ছেঁড়া জুতো, একটা খাটো বহরের কোরা ধুতি। অসুখে ভোগা চেহারা নয়, মনে হয় উপোসী চেহারা। লোকটার চোখ দুটো বেশ ডাগর, নাকটাও বেশ টিকালো। রুক্ষ-সুক্ষ চুলে লম্বা একটি তেড়ি এলোমেলো হয়ে রয়েছে।

জয়া বলেন—কে গো তুমি?

লোকটা বলে—আমি তোমাকে এতদিনে চিনতে পেরেছি মা, কিন্তু তুমি আমাকে দেখেও চিনতে পারছো না।

লোকটার দুই চোখ ছল ছল করে উঠলো। জয়া বলেন—কি চাও বলো?

লোকটা হাঁউ-মাউ করে কেঁদে ওঠে।—আপন মার কাছে মানুষ যা চায়, তাই চাই, আর কিছু চাই না।

জয়া—তার মানে?

লোকটা বলে—স্নেহ চাই মা।

অস্বস্তি বোধ করেন জয়া দেবী।—তুমি কে?

—নদীর ওপারে পলাশপুরের করুণা কালীর কাছে পনের দিন ধরনা দিয়েছিলুম মা। এক ফোঁটা জলও মুখে দিইনি, পনেরটি দিন আর পনেরটি রাত্রি করুণা কালীর পায়ের কাছে পড়েছিলুম। শেষে স্বপ্নে দেখা দিলেন করুণা কালী, আর বললেন··। লোকটা হঠাৎ চুপ করে।

জয়া দেবী—চুপ করলে কেন? বল।

—করুণা কালী বললেন, যা তোর আগের জন্মের মায়ের কাছে যা, তোর সব দুঃখু ঘুচে যাবে।

লোকটা কয়েক সিঁড়ি উপরে উঠে এসে বলে।—করুণা কালী বললেন, ঠাকুরপুরের রাজবাড়ির মা হলেন তোর আগের জন্মের মা। তাই ত ছুটে এলেম মা, মাগো।

চেঁচিয়ে ছটফট করে জয়া দেবীকে প্রণাম করার জন্য সিঁড়ি ধরে উপরের বারান্দার দিকে এগিয়ে আসতে থাকে লোকটা।

জয়া বলেন—থাম, বসো। ওসব কথা আমি বিশ্বাস করি না।

লোকটা ধপ্ করে বসে পড়ে। বিশ্বাস করতেই হবে মা।

জয়া দেবী হেসে ফেলেন। বিশ্বাস করি আর নাই করি, তুমি কি চাও বলো।

লোকটা কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখ মোছে এবং অভিমানের স্বরে বলে ওঠে—কিছু চাই না।

চুপ করে অনেকক্ষণ ধরে এই অদ্ভুত আবির্ভাবের রহস্যের দিকে তাকিয়ে থাকেন জয়া দেবী। এত কাঁদে কেন লোকটা? কেন এত অভিমান? পনেরটা দিন কিছু খায়নি। মাথা খারাপ হয়েছে বোধহয়; তবু ত মানুষ। ভুল স্বপ্ন দেখে আবোল তাবোল বকছে, কিন্তু কি দুর্ভাগ্য, একটা মিথ্যে স্বপ্নের জন্য কত কষ্ট পাচ্ছে ছেলেটা।

জয়া দেবী বলেন—কিছু খাবে?

—হ্যাঁ।

থালায় ভরে মিষ্টি নিয়ে আসেন জয়া দেবী। সব মিষ্টি খেয়ে নিয়ে ঢক ঢক করে জল খায় লোকটা। হঠাৎ বলে—এবার যাই মা।

জয়া বলেন—বসো।

একটা নতুন ধুতি, মানিকেরই জন্য কেনা, এক জোড়া নতুন চটি; আর একটা সিল্কের কামিজ নিয়ে আসেন জয়া। লোকটা ব্যস্তভাবে নতুন সাজ গায়ে চড়িয়ে আবার চুপ করে অন্যমনা হয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকে।

কিন্তু চলে যায় না লোকটা। এবং আরও অদ্ভুত, জয়া দেবীও লোকটাকে চলে যাবার জন্য বলতে পারে না। হয়ত পাগল, হয়ত একটা স্বপ্ন দেখেছে ছেলেটা কিন্তু সেই স্বপ্নটাকে মিথ্যে মনে করবারই কি আছে? আগের জন্মে একটা মায়ের কোলেই তো এসেছিল ছেলেটা, সে মা পৃথিবীতে এখন থাকতেও তো পারে।

জয়া বলেন—আজ যাও তুমি।

উদাসভাবে বলে লোকটা—যদি কয়েকটা টাকা দাও মা।

—কেন?

—কেন আবার কি? আমি তোমার ছেলে, টাকা চাইছি তোমার কাছে, দিতে হবে; রাগ করে চেঁচিয়ে আবার কেঁদে ফেলে লোকটা।

জয়া দেবী আর দেরী করেন না। তাব মনের ভিতরটা যেন একটা মূর্খ বিশ্বাসের বেদনায় ফুঁপিয়ে উঠছে। এক্ষুণি বিদায় করে দেওয়া ভাল। দশ টাকা নিয়ে এসে লোকটার হাতে তুলে দিয়ে জয়া বলেন,—এইবার যাও, আর বিরক্ত করো না।

লোকটা প্রসন্নভাবে অথচ তেমনি করুণ ও ছলছল চোখ নিয়ে এগিয়ে আসতে থাকে। বোধ হয় আগের জন্মের মাকে প্রণাম করতে চায়।

হঠাৎ একটা কঠোর গর্জনের আঘাতে চমকে ওঠে দুপুরের নীরবতা। ফটক পার হয়ে সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন চন্দননগরের ধীরেন ঠাকুরপো।—এ বেটা, এ বেটা এখানে কেন, অ্যাঁ?

তার পরেই এসে দাঁড়ায় শ্রীরামপুরের প্রতুল।—এ কি, এ বেটা এখানে এসে কি চাইছে বড়দি?

জয়া বলেন—ওকে চেন নাকি তোমরা?

প্রতুল বলে—চিনি বইকি, এটা একটা মহাপুরুষ।

জয়া দেবীর গলার স্বর ভয়ে কেঁপে ওঠে।—তার মানে?

ধীরেন ঠাকুরপো বলেন—মিথ্যে দুঃখের কথা বলে লোকের কাছ থেকে টাকা আদায় করাই ওর কাজ।

প্রতুল বলে—আজ তিন বছর দেখছি, ট্রেনে ট্রেনে ঘোরে, আর লোকের কাছ থেকে পিতৃশ্রাদ্ধের জন্য সাহায্য চায়।

ধীরেন ঠাকুরপো বলেন—সেদিনও আমাদের অফিসে গিয়েছিল, রুগ্না স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য সাহায্য চাইতে। আমাকে দেখেই পালিয়ে গেল।

লোকটা নির্বিকার। কোন ভয় বা উদ্বেগের ছায়ামাত্র নেই লোকটার চক্ষে।

ধীরেনবাবু বলেন—নিশ্চয়ই ওকে এই জুতো জামা আর কাপড় আপনি দিয়েছেন বৌদি?

প্রতুল বলে—নিশ্চয় কিছু টাকাও আপনার কাছ থেকে আদায় করেছে? জয়া দেবী বলেন—হ্যাঁ।

লোকটার ঘাড়ে হাত দেয় প্রতুল—বের কর টাকা। ফেরত দাও।

লোকটা বলে—কেন দেব? আমার আগের জন্মের মা আমাকে দিয়েছেন, আপনারা সে টাকা কেড়ে নেবার কে মশাই?

ধীরেনবাবু লোকটাকে একটা ধাক্কা দেন।—ছাড়, নতুন কাপড়-চোপড় জুতো সব ছাড়।

ধাক্কার চোটে লোকটার পা থেকে নতুন চটি খসে যায়। ধীরেনবাবু এক টান দিয়ে সিল্কের কামিজটাকে লোকটার গা থেকে খুলে নিলেন।

চেঁচিয়ে ওঠে লোকটা—মা, ওগো মা, তুমি চুপ করে দাঁড়িয়ে কি দেখছো মা? এদের মানা কর মা।

জয়া দেবী নীরবে দাঁড়িয়ে শুধু তাঁর দু'চোখের একটা অর্থহীন চাহনি তুলে তাকিয়ে থাকেন।

প্রতুল লোকটার হাত ধরে টান দেয়। লোকটার শক্ত মুঠো কঠোর এক পেষণে চূর্ণ করে দিয়ে টাকা কেড়ে নেয় প্রতুল। ধীরেনবাবু আবার একটা ধাক্কা দিয়ে লোকটাকে ফটকের দিকে টেনে নিয়ে চললেন।

লোকটা চিৎকার করে।—মা, ওগো মা, এরা যে আমার সব ছিনিয়ে নিল মা। তুমি ওদের মানা কর মা।

জয়া দেবীর মনের ভিতরে যেন একটা বোবা বিস্ময় দুঃসহ বেদনায় ছটফট করছে। কোন কথা বলতে পারছেন না জয়া দেবী। মিথ্যাবাদী একটা লোক ধরা পড়ে গিয়েছে আর জব্দ হয়েছে, জয়া দেবী বাধা দেবেন কেন?

ফটকের কাছে লোকটাকে ঠেলে নিয়ে এলেন ধীরেনবাবু। এইবার ধীরেনবাবুর হাতের আর একটি ধাক্কায় অদৃশ্য হয়ে যাবে জয়া দেবীর দুই চক্ষুর সম্মুখ থেকে এক মিথ্যা আগের জন্মের ছেলে।

লোকটা মুখ ফিরিয়ে জয়া দেবীর দিকে হতাশভাবে তাকায়।—তুমি আমার আগের জন্মের মা, কিন্তু তুমি মা হয়েও কি করেছিলে জান? করুণা কালী স্বপ্নে আমাকে কি বলেছেন শুনবে?

লোকটার ছলছল চোখ দুটো হঠাৎ কটমট ক'রে ওঠে। ধীরেনবাবু ও প্রতুল হঠাৎ হাত নামিয়ে কৌতূহলী হয়ে তাকিয়ে থাকেন। জয়া দেবী অপলক চোখে তাকিয়ে থাকেন। কি বলতে চায় লোকটা?

লোকটা বলে—তুমি মা হয়েও নিজের হাতে আমার মুখে বিষ দিয়ে আমাকে মেরে ফেলেছিলে।

লোকটাকে কঠোর একটা ঠেলা দিয়ে ফটকের বার করে দেন ধীরেন-বাবু। প্রতুল হাত তুলে তাড়া করে যায় আরও কয়েক ঘা দেবার জন্য।

বাধা দিয়ে জয়া দেবীই আর্তনাদ করেন।—আর মের না ধীরেন ঠাকুরপো, চলে এস প্রতুল। যেতে দাও ওকে।

জয়াদেবীর চোখ ঝাপসা হয়ে যায়, তাই দেখতে পান না, লোকটা চলে গিয়েছে কি না। জয়া-মাকে মিথ্যা-মা বলে রটাতে চায়, কি ভয়ানক মিথ্যেবাদী ঐ ছোঁড়া! কিন্তু জয়া দেবীর বুকের ভিতরটা কাঁপতে থাকে। মিথ্যে একটা গল্প, কিন্তু কি ভয়ানক সত্যের মত একটা মিথ্যা!

## নমিতার সেতার

সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফেরবার পথে মস্ত বড় বাড়িটার তেতলার বারান্দার দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন দেবেশবাবু।

তেতলার বারান্দার আলো ঝকমক করে। বড় বড় কৌচ আর সোফার রঙীন ভেলভেট জলজল করে। লাফ দিয়ে ছুটোছুটি করে একটি শিশু হাউণ্ড। একটা সোফার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ে। ঐ তেতলা বাড়ির প্রভু শ্রীমোহন সান্যালের মেয়ে লেখা সান্যাল।

বেশ তো দেখতে মেয়েটি। দেখতে থাকেন দেবেশ বাবু। সুন্দর সাজে সেজে রয়েছে লেখা সান্যাল, আর হাতের কাছে একটা সেতার। সেতারটাও খুব দামী বলে মনে হয়।

দেখবার জন্য নয়, শোনবার জন্যই পথের উপর এক গাছের ছায়ার আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকেন দেবেশবাবু। দেবেশবাবুর সব কৌতূহল তাঁর দুই কানের মধ্যেই যেন ছটফট করছে। শুনতে চান দেবেশবাবু, লেখা সান্যালের হাতের সেতার কত মিষ্টি ঝংকার দিতে পারে। জানতে চান দেবেশবাবু, সেসন জজ শ্রীমোহন সান্যালের মেয়ে লেখা সান্যাল সেতারেতে তার মেয়ে নমিতার চেয়ে ভাল হাত তৈরী ক'রে ফেলতে পেরেছে কি?

তেতলা বাড়ির বারান্দায় ঐ সুন্দর মেয়েটিই হলো দেবেশবাবুর মেয়ে নমিতার প্রতিদ্বন্দ্বিনী। সেতার বাজনার এক প্রতিযোগিতা আয়োজন করেছে বাণীনিকেতন। কলকাতা শহরের চারজন বিখ্যাত গুণী, দু'জন বিখ্যাত সাহিত্যিক, একজন সরকারী মন্ত্রী, একজন বিশিষ্ট মারোয়াড়ী ব্যবসায়ী, একজন সিনেমাবিশেষজ্ঞ আর তিনজন অধ্যাপককে নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়েছে। এই কমিটি বিচার করবেন, এই বছরের সেতার বাজনার প্রতিযোগিতায় বাণীনিকেতনের স্বর্ণপদক কা'কে উপহার দেওয়া হবে। যাকে মোট বিশজন প্রতিযোগিনীর মধ্যে সেতার বাজনায় শ্রেষ্ঠা বলে মনে হবে।

দেবেশবাবুর মেয়ে নমিতাও একজন প্রতিযোগিনী। তিন দিন অফিস কামাই ক'রে অনেক দৌড়াদৌড়ি আর ধরাধরি ক'রে তবে দেবেশবাবু এই

প্রতিযোগিতায় নমিতার জন্য একটি স্থান যোগাড় করতে পেরেছেন। বাণী নিকেতনের সদস্যদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ধর্না দিয়েছেন দেবেশবাবু। কিন্তু দেবেশবাবুর অনুরোধ বার বার ব্যর্থ হয়েছে। আজে বাজে লোককে প্রতিযোগিতায় স্থান দেবার রীতি নেই। কোন বড় গুণী বা ওস্তাদের চিঠি চাই, কিংবা কোন গানের স্কুলের সার্টিফিকেট, নইলে শুধু দশটাকা ফী দিলেই প্রতিযোগিতায় কাউকে নেওয়া হয় না।

পাড়ার বিজনবাবুকে অনেক সাধ্যসাধনা ক'রে, তাঁরই কাছ থেকে চিঠি নিয়ে, এক বিখ্যাত সুরশিল্পীর কাছে গিয়েছেন দেবেশবাবু। বিখ্যাত সুরশিল্পী ভ্রূকুটি ক'রেছিলেন, কিন্তু বিজনবাবুর মত এতবড় একজন বড় লোকের চিঠির দিকে তাকিয়ে শেষ পর্যন্ত সার্টিফিকেট দিলেন। সেতার হাতে নিয়ে বাজনার পরীক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল নমিতা। কিন্তু সুরশিল্পী বলেন—ওসব থাক্, বিজনবাবু যখন বলেছেন ভাল সেতার বাজায়, তখন আর পরীক্ষা করার দরকার নেই।

সার্টিফিকেট যোগাড় করতে যে সংগ্রাম করেছেন দেবেশবাবু, তার চেয়ে বেশি সংগ্রাম করতে হয়েছে দশ টাকা যোগাড় করার জন্য, প্রতিযোগিতায় ভর্তির ফী পুরো দশটী টাকা।

সত্যিই ঐ দশটী টাকা যোগাড় করতে গিয়ে দেবেশবাবুর ঘর অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। এখানে ওখানে ধারের জন্য হাত পেতেও ধার পান নি। মাসের আর দুটি সপ্তাহের রেশন আনবার মতো, আর ইলেকট্রিকের আলোর বিল শোধ করার মতো টাকা শুধু আছে। কিন্তু রেশনটা তো আর বাদ দেওয়া যায় না, পেটের দাবী কোন সেতারের সুরের ও মিষ্টি স্বরের কোন দাবীর ধার ধারে না। অগত্যা, শেষ পর্যন্ত এই মাসের ইলেকট্রিক আলোর বিলটাকেই উপেক্ষা করলেন দেবেশবাবু। ইলেকট্রিক কোম্পানীর লোক এসে তার কেটে দিয়ে গেল।

রেশন আনতে যার টাকার টান পড়ে, টাকার অভাবে ঘরের আলো বন্ধ হয়ে যায়, এ হেন মানুষের মনে ঐ এক সৌখীন স্বপ্ন এক মোহ হয়ে উঠেছে। অফিস থেকে ফিরে এক গেলাস চা খেয়ে নিয়ে কোলের কাছে তবলা-বাঁয়া টেনে নিয়ে বসেন দেবেশবাবু। আর মেয়ে নমিতা একটা ময়লা স্বরলিপির বই সামনে রেখে হাতের কাছে সেতার টেনে নিয়ে বসে। তবলাতে নানা তালের রকম আর কসরৎ ধ্বনিত করেন দেবেশবাবু।

টুইলের ছেঁড়া কামিজের আস্তিন গুটিয়ে রোগা হাত দুটিকে নানা ভঙ্গীতে আর উৎসাহে খেলিয়ে খেলিয়ে তবলা বাজান দেবেশবাবু। আর মেয়ে নমিতা সেই মিষ্টি বোলের তাল ও মাত্রার প্রতিটি সূক্ষ্ম শিহরের সঙ্গে তার সেতারের স্বরঝংকার লুটিয়ে দিতে থাকে। একটা ইমনকল্যাণ শেষ করতেই রাত দশটা বেজে যায়। দেবেশবাবু বলেন, আর আধঘণ্টা মাত্র আর একটু খেটে নে নমি, একটা বাগেশ্রী আলাপ কর দেখি।

এরই মধ্যে, মাত্র ছয় বছরের চেষ্টায় কী মিষ্টি হাত ক'রে ফেলেছে মেয়েটা! দেবেশবাবু তাঁর ছেঁড়া টুইলের আস্তিনে কপালের ঘাম মুছে হাঁপাতে হাঁপাতেও হাসতে থাকেন। বেশ গর্ব করেই বলেন—মাত্র আর দুটি বছর খুব খেটে যা নমি। তারপর দেখবি, অল ইণ্ডিয়া মিউজিকে গিয়ে দাঁড়াতে তোকে একটুও ঘাবড়াতে হবে না।

তারপরেই যেন নিজের মনেই বলতে থাকেন—সাধনা থাকলে সিদ্ধি হয় আর গুণ কখনো চাপা পড়ে থাকে না।

গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আর তেতলার বারান্দার দিকে তাকিয়ে উৎকর্ণ দেবেশবাবুর বুকটা হঠাৎ একটি মিষ্টি শব্দ শুনে ছ্যাক ক'রে ওঠে। সেতারে হাত দিয়েছে লেখা সান্যাল। বাজছে সেতার। টুং টাং টুং টাং, মিষ্টি শব্দের ছোট ছোট ফুল যেন ফুটে উঠেছে। বোধ হয় একটা টোড়ি ধরেছে লেখা সান্যাল। দুই কান সজাগ ক'রে আর নিঃশ্বাস রুদ্ধ ক'রে শুনতে থাকেন দেবেশবাবু।

চমকে উঠলেন দেবেশবাবু। সেতারের শব্দ নয়, খিল খিল হাসির শব্দ। দেখলেন দেবেশবাবু, তেতলার বারান্দায় কার্পেটের উপর গড়াচ্ছে লেখা সান্যালের সেতার। আর লেখা সান্যাল তার দুরন্ত শিশু হাউণ্ডকে কোলে নেবার জন্যে ছুটোছুটি করছে, কিন্তু ধরতে পারছে না হাউণ্ডকে।

তবু দাঁড়িয়ে রইলেন দেবেশবাবু। তাঁর মনের ভয় আর কৌতূহল একেবারে মিটিয়ে নিয়ে আজ নিশ্চিন্ত হবেন দেবেশবাবু। সত্যিই কি টোড়িতে হাত তৈরী ক'রে ফেলেছে লেখা সান্যাল। আশ্চর্য নয়। সপ্তাহে তিন দিন ওস্তাদ আসে, আর ঐ এত দামী সেতার, তার উপর মেয়েটিও খুব স্মার্ট! ঐ হাত একটি টোড়িতেই মাৎ করে দেবে বাণী-নিকেতনের কমিটির আসর। কিন্তু সত্যিই কি তাই?

আবার সেতার হাতে তুলে নিয়েছে লেখা সান্যাল। বাজছে সেতার!

উৎকর্ণ হয়ে শুনতে শুনতে হেসে ফেললেন দেবেশবাবু। নিতান্তই ছেলে-মানুষী ব্যাপার। লেখা সান্যালের সেতার যেন একটা শখের পুতুল মাত্র। পলকা ও চটুল সুরে একটা থিয়েটারী ঢঙের গৎ বাজছে লেখা সান্যালের সেতারে। নিতান্তই ছেলেমানুষী কাণ্ড। সুর নিয়ে ছেলেখেলার ব্যাপার। দু' দশ জন গুণীর আসরে ঐ সস্তা গৎ-এর কোন সম্মান নেই।

লেখা সান্যালের সেই চটুল গৎ-ও হঠাৎ যেন মরে গেল। দেখলেন দেবেশবাবু, চাকরের হাতে ট্রে থেকে চা-এর কাপ তুলছে লেখা সান্যাল।

চায়ে চুমুক দিয়েই সেতারটাকে এক ঠেলায় সরিয়ে দেয় লেখা সান্যাল। আর, একটা রঙীন বই খুলে নিয়ে পড়তে থাকে।

হাসতে থাকেন, এবং একটু যেন কষ্টও হয় দেবেশবাবুর। বেচারা লেখা সান্যাল, এই সামান্য যোগ্যতা নিয়ে প্রতিযোগিতায় নামতে চায়! কিন্তু চেষ্টা ক'রে শিখলেই তো পারতো। টাকা পয়সা আছে, সময় আছে, আর শখও যখন আছে, তখন সেতার নিয়ে এরকম একটা অবহেলার খেলা কেন?

মনে পড়ে দেবেশবাবুর; কাল সন্ধ্যাতেই বাণীনিকেতনের সেতার প্রতি-যোগিতার সময় ঠিক করা হয়েছে। আজ মাঝরাত পর্যন্ত সেতার সাধবে নমি। কাল অফিস কামাই করতে হবে। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত একটানা চেষ্টা ক'রে নমি যদি একটা টোড়ি আর একঠা মালকোষ রপ্ত ক'রে নেয়, তবেই আর ভাবনা করার কিছু থাকে না। সেতারে লেখা সান্যালের কত সুখ্যাতিই না শুনেছিলেন দেবেশবাবু। কিন্তু নমির কাছাকাছি ঘেঁসবারও কোন যোগ্যতা আছে এই সব প্রতিযোগিনীর?

নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেলেন দেবেশবাবু।

বাণী-নিকেতনের সেতার প্রতিযোগিতার আসরে স্বরঝংকারের উৎসব জেগে ওঠে। বিচারক কমিটি চোখ বন্ধ ক'রে শুধু দুই কানে কৌতূহল জাগ্রত ক'রে শুনতে থাকেন এক এক জন প্রতিযোগিনীর সেতারের সুর ও স্বর, মীড় গমক আর মূর্চ্ছনা। এক এক জনের জন্য মাত্র আধ ঘণ্টা সময়। কাগজের উপর লেখা প্রতিযোগিনীদের নামের পাশে নম্বর দেন বিচারকেরা।

অত্যন্ত নিরপেক্ষ বিচারক কমিটি। মাথা দুলিয়ে, বা তারিফ ক'রে, কিংবা সামান্য একটু বাহবা ধ্বনি ক'রেও মনের আনন্দ প্রকাশ ক'রে ফেলেন না বিচারকেরা। করলে পক্ষপাতিত্ব করা হয়। একজন প্রতি-

যোগিনীকে উৎসাহিত করলে আর একজন প্রতিযোগিনী হতাশ হয়ে যেতে পারে। তাই অত্যন্ত সাবধান হয়েছেন বিচারক কমিটি। শুধু গুণ দেখেই গুণের বিচার করবেন তাঁরা।

টোড়ি বাজালো নমিতা। আসরে এক কোনে ছেঁড়া টুইলের আস্তিন দিয়ে মাঝে মাঝে আনন্দের আবেগে চোখের জল মোছেন দেবেশবাবু।

কি কাণ্ডই করছে নমি'টার হাতের সেতার। তালগুলিকে কী সুন্দর মিলিয়ে দিচ্ছে একটুও ভুল হচ্ছে না।

নমিতার মাও এসেছেন। কেল্‌টি মেয়ে ব'লে দিনে তিনবার ধমক দেন যে কালো মেয়েটাকে, সেই মেয়েটারই মুখটা কি সুন্দরই না দেখাচ্ছে। নমি'র শাড়ির আঁচলটা পিঠের কাছেই কত বড় একটা ছেঁড়া প্রকাশ ক'রে দিয়ে ফরফর ক'রে উড়ছে। কিন্তু কোন ভ্রূক্ষেপ নেই, নিজের সেতারের শব্দে যেন মনপ্রাণ বিভোর হয়ে আছে মেয়েটার। সন্ন্যাসিনীর মতো দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রয়েছে মেয়েটার চোখ দুটো। এত গুণও ছিল এই কেল্‌টি মেয়েটার। নমিতার মা'র চোখ দুটো ঝকঝক ক'রে হাসে।

দেখছেন দেবেশবাবু, মুগ্ধ হয়ে আর চোখ বন্ধ করে নমিতার টোড়ি শুনছেন বিচারক কমিটি। কোন সন্দেহ নেই, মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে সবাই।

থামলো নমিতার টোড়ি। বিচারক কমিটি একবার তাকিয়ে দেখলেন নমিতাকে। কাগজের উপর নম্বর লিখলেন। দেবেশবাবুর চোখের সামনে একটা মধুর স্বপ্ন ঝক্ ক'রে ভেসে ওঠে। কল্পনায় দেখতে থাকেন, নমিতার ছেঁড়া শাড়ির আঁচলের গায়ে একটি সোনার মেডেল ঝুলছে।

হঠাৎ একটা চাঞ্চল্যের সাড়া পড়ে গেল আসরে। বাণী-নিকেতনের কর্মীরা একটু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। একটু বেশি পাওয়ারের একটা আলো এনে রাখা হলো বাজনার আসরে। তবলা-বাঁয়া বদল করা হলো, এল নতুন এক-জোড়া তবলা-বাঁয়া। মাইক্রোফোনের মিস্তিরিও একটু ব্যস্ত হয়ে মাইক্রো-ফোনকে নানাভাবে নাড়াচাড়া করে। সেসন জজ শ্রীমোহন সান্যালের মেয়ে লেখা সান্যাল বসলো সেতার হাতে নিয়ে। সান্যাল বাড়ির মোটর ড্রাইভার দেশী মহারাজার মতো যার সাজ-পোষাক, সেই এসে দশটা ফুলের তোড়া আসরের উপর সাজিয়ে রেখে গেল।

তাকিয়ে রইলেন বিচারক কমিটি।

তাকিয়ে রইলেন দেবেশবাবু। কী সুন্দর সাজ করেছে লেখা সান্যাল।

নমিতার মা দেবেশবাবুর কানে কানে বললেন—উমা বলেছে, আজ দুপুর থেকেই সাজতে আরম্ভ করেছিল লেখা।

প্রতিযোগিতার আনন্দের উপর দিয়ে যেন মুহূর্তের মধ্যে একটা বিপ্লব ঘটে গেল। বসে আছেন সেসন জজ শ্রীমোহন সন্যাল, কোলের উপর শিশু হাউণ্ড। দাঁড়িয়ে আছে দেশী মহারাজার মতো পোষাক, সান্যাল বাড়ির ড্রাইভার। তার উপর, বিদ্যুতের চোখ ঝলসানো বাতি, লেখা সান্যাল সেতার হাতে তুলে নিতেই লেখার হাতের চার আঙ্গুলে চারটে হীরার আংটি ঝিলিক দিয়ে হেসে উঠলো। তাকিয়ে রইলেন বিচারক কমিটি।

মাৎ ক'রে দিল লেখা সান্যালের গৎ। লেখার সেতারের প্রতি ঝংকারের সঙ্গে মাথা দুলিয়ে আর বাহবা দিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করতে থাকেন বিচারক কমিটি। বাণী-নিকেতনের কর্মীরা মুগ্ধ হয়ে লেখা সান্যালের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। গৎ থামতেই করকাপাতের মতো করতালির শব্দে মুখর হয়ে ওঠে আসর।

উল্লাস জাগে। ধন্যবাদ শুভেচ্ছা, ও প্রীতির উচ্ছ্বাস বর্ষিত হতে থাকে। পুরস্কার ঘোষণা করেন বিচারক কমিটি। উৎকর্ণ হয়ে শুনতে থাকেন, আর পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে থাকেন দেবেশবাবু।

সেতার বাজনায় শ্রেষ্ঠ হয়েছে লেখা সান্যাল। সোনার মেডেল ঝুলছে লেখা সান্যালের কাঁধের কাছে, রঙীন সিল্কের শাড়ির কুঞ্চিত আঁচলের একটি স্তবকের উপর। পাথরের মতোই চোখ নিয়ে দেখতে থাকেন দেবেশবাবু।

যেন পৃথিবীর সব সেতারের তার ছিঁড়ে পুড়ে ভস্ম হয়ে গিয়েছে, আর সেই ভস্ম উড়ছে দেবেশবাবু হৃৎপিণ্ডের ভিতরে। নমিতার মা ঠেলা দিয়ে বলেন—বাড়ি চলো।

নমিতা সেতার হাতে নিয়ে এগিয়ে এসে বলে—চলো বাবা।

দেবেশবাবু বলেন—চল।

রাত হয়েছে। দেবেশবাবুর সৌখীন স্বপ্নকে বিদ্রূপ ক'রে ইলেকট্রিক বাতি নিভে গিয়েছিল কদিন আগেই। কিন্তু ঘরের এই অন্ধকারকেই বিদ্রূপ ক'রে ঘরের বাইরে এক ফালি উঠানের এক কোনে এসে বসলেন দেবেশ-বাবু। হাতের কাছে রাখলেন তবলা আর বাঁয়া। নমিতা বসলো সেতার নিয়ে।

ছেঁড়া টুইলের আস্তিন গুটিয়ে নিয়ে দেবেশবাবু যেন হুংকার দিলেন—ধর একটা পুরিয়া।

পাড়ার লোক শুনে আশ্চর্য হয়, হেরে গিয়ে আবার এত আনন্দের ঝংকার কেন? মাঝরাত পর্যন্ত বাজনা নিয়ে মাতামাতি?

হ্যাঁ, সেই মাঝরাতের পরেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত নমিতার সেতারের পুরিয়া দেবেশবাবুর তবলার বোলের সঙ্গে যেন এক স্নেহের উৎসবে লুটোপুটি ক'রে পাড়ার নিস্তব্ধতাকে ঝংকারে ঝংকারে শিউরে দিতে থাকে। উমাদের বাড়ির চিলকোঠার পাশ দিয়ে আকাশের চাঁদ দেখা যায়। যেন ভিন জগতের একটা উপহার, সোনার মেডেল হয়ে ফুটে উঠেছে অনেক রাতের চাঁদ।

দেবেশবাবুর দুই চোখ ঝকঝক করে।—এইবার জলদে নিয়ে চল্ নমি।

বলিহারি! মরি মরি! বাহবা বাহবা! দেবেশবাবুর মনের উল্লাস যেন নিজের আবেগেই মুখর হয়ে আর আত্মহারা হয়ে বাতাস শিউরে দিতে থাকে।

বিভোর হয়ে সেতার বাজাতে থাকে নমিতা।

কিছু ভাবিস না নমি। নমিতার হাতের সেতারে যেন নতুন প্রাণের আশ্বাস ছড়িয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন দেবেশবাবু। যেন এই মাঝরাতের আসরে নমিতার হাতে সেতারের গুণ বিচার করছেন সত্যিকারের এক বিচারক এবং সেই বিচারককে দেখতে পেয়েছেন দেবেশবাবু, নইলে তাঁর চোখে-মুখে এরকম উল্লাস জেগে উঠবে কেন?

## ঐতিহাসিক বস্তুবাদ

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ; হিস্টরিকাল মেটিরিয়ালিজম্। কথাটার অর্থ বুঝতে অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু বুঝতে পারি নি। আজ হঠাৎ মনে হয়েছে যেন বুঝতে পেরেছি। কারণ আজই হঠাৎ মনে পড়ে গেল আমাদের সেই কলেজের অধ্যাপক বিমল বসুর কথা।

তিনি ছিলেন আমাদের ইতিহাসের অধ্যাপক। বয়সের দিক দিয়ে তিনি অধ্যাপকদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট ছিলেন, কিন্তু কলেজে ঢুকে প্রথম বছরের প্রথম দিনেই আমরা বুঝে ফেলেছিলাম যে, বিদ্যাবত্তার দিক দিয়ে তিনিই অধ্যাপকদের মধ্যে সবচেয়ে বড। প্রথম দিনেই ইংরেজির ক্লাস, লজিকের ক্লাস ও সংস্কৃতের ক্লাস মনের ভিতর কেমন যেন একটা দুর্ভাবনা ছড়িয়ে দিয়ে গেল। অধ্যাপকেরা নানা বই ঘাঁটলেন এবং পড়ালেন; পড়াতে গিয়ে অনেক কিছু বোঝালেন, এবং বোঝাতে গিয়ে যথেষ্ট ভয়ও পাইয়ে দিলেন। কিন্তু ইতিহাসের ক্লাসটা আমাদের মন একেবারেই মুগ্ধ করে দিল।

অধ্যাপক বিমল বসু ইতিহাসের বই ছুঁলেন না; ইতিহাসের নামে শুধু একটি বক্তৃতা দিলেন। কিন্তু কি অদ্ভুত বক্তৃতা, একেবারে বক্তৃতা বলেই মনে হয় না। একটা অভিনয়। যেন এক নাটকের চন্দ্রগুপ্ত মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে তাঁর মনের যত আশা আকাঙ্ক্ষা আক্ষেপ আর প্রতিজ্ঞার কথা অনর্গল বলে চলেছেন। তিনি বললেন আমি ইতিহাসের প্রফেসর নই, আমিই ইতিহাস। ইতিহাস আমার স্বপ্নে, ইতিহাস আমার রক্তে ও স্নায়ুতে।

আজও মনে পড়ে, কলেজে ঢুকে প্রথম দিনেই ইতিহাসের প্রফেসর বিমল বসুকেই আমাদের সবচেয়ে বেশী ভাল লেগেছিল। তাঁর চেহারাটিও বেশ, সাজ-পোশাকেও বেশ একটা ছিমছাম স্টাইল ছিল। গেরুয়া রঙের মিহি খদ্দরের ঢিলে পাঞ্জাবি পরতেন তিনি। চশমার ফ্রেম সোনার। আর পায়ে থাকত জরি বসানো মুলতানী নাগরা। ধুতি ছিল সিল্কের। তিনিই বলতেন, কেন তিনি সিল্কের ধুতি পরেন। সিল্ক হল চীনাংশুক। এই সিল্কের সঙ্গে ইতিহাসের মস্ত বড একটা স্মৃতির এসোসিয়েশন রয়েছে। সুদূর

অতীতে ভারতের সঙ্গে চীনের যে অতি সুন্দর একটি অন্তরঙ্গ সম্পর্কের বন্ধন ছিল, এই সিল্কের মধ্যে যেন তারই স্পর্শ অনুভব করা যায়।

সত্যিই জিনিয়াস! ইতিহাসের প্রফেসর বিমলবাবুর মত এমন মনে-প্রাণে বিদ্বান প্রফেসর আমাদের সেই কলেজে আর কেউ ছিল না। বাংলার প্রফেসর বুড়ো চারুবাবুও একদিন আমাদের এই বিশ্বাসটাকেই আরও উৎসাহিত করে দিলেন।

প্রশ্ন করেছিলেন চারুবাবু, কি হে, কেমন লাগছে কলেজের পড়া।

মাধব উত্তর দিল, ইতিহাসের পড়া সবচেয়ে ভাল লাগছে সার্।

চমকে উঠলেন চারুবাবু, ও প্রফেসর বিমল বসুর ক্লাস?

ইন্দু—হ্যাঁ; সার্।

চারুবাবু কেমন যেন চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে থাকেন, তা তো লাগবেই, বিমল বসুর ইতিহাস তোমাদের মনে ধরবারই কথা।

আমি বলি, প্রফেসর বসু মস্ত বড় স্কলার, নয় কি সার্।

চারুবাবু—হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। উনি একটি গ্রেট্ ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল্।

মাধবের দুই চোখে ভক্তিভরা বিস্ময় উথলে ওঠে: আপনিও তা হলে বিশ্বাস করেন সার্।

চারুবাবু—করি বইকি। তোমাদের প্রফেসর বিমল বসু যখন দিনের মধ্যে অন্তত পাঁচবার নিজেই নিজেকে গ্রেট ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল্ বলেন, তখন কথাটা বিশ্বাস করতেই হয়।

চলে গেলেন অধ্যাপক চারুবাবু। ইন্দু বলে, উনি মনে মনে বিশ্বাস করেন ঠিকই, কিন্তু একটু হিংসেও করেন বোধ হয়।

এক সপ্তাহ পরে আরও বুঝলাম, প্রফেসর বিমল বসু স্বয়ং ইতিহাস তো নিশ্চয়ই, তার উপর আরও একটু। তিনি বললেন, পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে বেশী মহৎ, উদার, উদাত্ত, অত্যুজ্জ্বল ও অপূর্বসুন্দর একটি মানুষকে আমি আমার মনের মণিকোঠায় পুষে রেখেছি। তিনিই আমার জীবনের আদর্শ; তিনি আমার সব চিন্তার কাণ্ডারী; সব পথের দিশারী। তিনি হলেন, দেবানাং প্রিয় প্রিয়দর্শী মহারাজ অশোক।

আমরা মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকি প্রফেসর বসুর মুখের দিকে, কিন্তু তিনি আমাদের কারও বিস্মিত মুখের দিকে না তাকিয়ে স্বপ্নালু চোখের দৃষ্টি দূরের ওই সীতাগড় হিলের চূড়ার দিকে প্রসারিত করে দিয়ে বলতে থাকেন, এক

এক সময় হঠাৎ অনুভব করি, আমি যেন পাটলিপুত্রের পাথর-বাঁধানো পথের উপর মধ্যাহ্নের রৌদ্রজ্বালার মধ্যে একা দাঁড়িয়ে আছি। দূরে একটা ছায়াময় অশ্বত্থ। সেই অশ্বত্থের ছায়াতলে দাঁড়িয়ে এক শান্ত সৌম্য ও স্নিগ্ধ মূর্তির মানুষ হাত তুলে আমাকে তাঁর নিকটে যেতে ডাকছেন। কে তিনি? তিনি হলেন প্রিয়দর্শী অশোক।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন প্রফেসর বসু। তারপর হাতের কাছে একটা বই টেনে নিয়ে বললেন, অশোক দি গ্রেট, এন্‌সিয়েণ্ট হিস্টরি অব ইণ্ডিয়া পেজ ফিফটি সেভেন।

এই প্রথম ইতিহাসের বই স্পর্শ করলেন প্রফেসর বসু। আমরা এই প্রথম ইতিহাসের বইয়ের পাতা উল্টে অশোক দি গ্রেটকে খুঁজে বের করলাম। অশোকের জীবন আর কীর্তি সম্বন্ধে অনেক নতুন কথা বললেন প্রফেসর বসু, যে-সব কথা পাঠ্য বইটার মধ্যেই নেই।

প্রফেসর বসু বললেন, অশোক সম্বন্ধে আমি আড়াই শো ছোট বড় বই পড়েছি, অশোকস্তম্ভের ছায়ায় বসে দশটি দুপুর কাটিয়েছি। আমাকে যদি বুঝতে পার, তবে অশোককেও তোমরা বুঝতে পারবে। আর অশোককে যদি বুঝতে পার, তবে আমাকেও বুঝতে পারবে।

বই বন্ধ করে শেষ কথা বলে ক্লাস শেষ করলেন প্রফেসর বিমল বসু।—চারুবাবু আমাকে আড়ালে আড়ালে বিদ্রূপ করেন। আমি নাকি একজন খাঁটি অশোকিস্ট। কিন্তু তোমরা বিশ্বাস কর, চারুবাবুর এই ঠাট্টার কথা শুনে আমি মনে মনে গৌরব অনুভব করি।

চারুবাবুর উপর আমাদের মন আবার বিরূপ হয়ে ওঠে। প্রফেসর বসুর মত এমন একজন ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল্‌ আর ভাবুক মানুষের নামে এ রকম ঠাট্টার চিমটি কেটে বেড়াবার দরকার কি? ইতিহাসের অশোককে জীবনের ধ্যানের বিষয় করে তুলেছেন প্রফেসর বসু। বেশ করেছেন। তাতে চারুবাবুর এত ক্ষুব্ধ হবার কি আছে?

এখনও বিয়ে করেননি প্রফেসর বসু। নিজের মন আর পাটলিপুত্রের স্বপ্ন নিয়ে যেন এক ভাবরাজ্যের মধ্যে একা ঘুরে বেড়াচ্ছেন। চারুবাবুর মত দু'বেলা প্রাইভেট পড়া পড়িয়ে টাকা রোজগার করেন না। এই যুগের যত স্বার্থ লোভ আর মতলব থেকে অনেক দূরে আর অনেক উর্দ্ধে রয়েছেন প্রফেসর বসু। তাঁর বাড়িতে গিয়েও দেখেছি, বিছানার উপর ছড়িয়ে রয়েছে

সম্রাট অশোকেরই যত শিলালিপির ছবি। দেখেছি, তিনি ব্রাহ্মী লিপিতে তাঁর আত্মজীবনী লিখছেন। কথায় কথায় মন্ত্রের মত কত অদ্ভুত সব ছড়া তিনি অনর্গল উচ্চারণ করেন। তিনি বলে দেন বলেই বুঝতে পারি ভাষাটা হল দু হাজার বছর আগের মাগধী-প্রাকৃত।

প্রফেসর বিমল বসু একটি জিনিয়াস, একটি গ্রেট ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল্‌, এবং অদ্ভুত স্কলার। কিন্তু কি আশ্চর্য, এসব সত্য জেনেও এবং চোখের উপর দেখতে পেয়েও ক্লাসের অনেক ছেলে ঠিক আমাদের মত মুগ্ধ হয় না। ওরা চায়, প্রফেসর বসুও চারুবাবুর মত শুধু পড়াবেন। একটা মাস যেতে না যেতে দেখলাম, অনেক ছেলে হিস্টরি ছেড়ে দিল। অন্য সাবজেক্ট নিয়ে অন্য ক্লাসে ভিড় জমাল।

মাধব বলে, আমিও হিস্টরি ছেড়ে দিয়ে বোটানি নিতাম, কিন্তু ছাড়তে পারছি না, প্রফেসর বসুর অদ্ভুত পার্সোনালিটির জন্যই। এই রকম একটি মানুষের সঙ্গে আধ ঘণ্টা সময় পার করে দেওয়াই যে মস্ত বড় একটা শিক্ষা।

কলেজের ক্লাসের বাইরে মাঝে মাঝে যখন প্রফেসর বসুর সঙ্গে আমাদের দেখা হয়, তখনও আমরা একরকমের শিক্ষাই পেয়ে থাকি। তাঁর সব কথার মধ্যেই যেন অদ্ভুত একটা আবেদন আছে। জীবনকে মহৎ করে তোলবার আবেদন। শোন, বোঝ, বুঝতে চেষ্টা কর আমাকে তার মানে সম্রাট অশোকের সেই বিরাট আদর্শের এক-একটি বাণীকে, তা হলেই সব শিক্ষার বড় শিক্ষা পেয়ে যাবে।

মাধব বলে, তা হলে হিস্টরিতেও নিশ্চয় আমরা বেশ স্ট্রং হতে পারব স্যার্। কম করে সিক্সটি পারসেন্ট মার্ক রাখতে পারব।

চমকে ওঠেন প্রফেসর বসু। রুমাল দিয়ে চশমার কাচ মুছে নিয়ে উদাস এবং যেন একটু ব্যথিত ভাবে মাধবের মুখের দিকে তাকান। তারপর গম্ভীর হয়ে বলেন, তোমার কথা শুনে বড় দুঃখিত হলাম মাধব।

মাধব অপ্রস্তুত হয়: কেন স্যার্?

প্রফেসর বসু বলেন, আদর্শবাদ ও বস্তুবাদ এক জিনিষ নয়।

ইন্দুও বিরক্ত হয়ে মাধবের দিকে ভ্রূকুটি করে: আইডিয়ালিজম্ আর মেটিরিয়ালিজম্ এক জিনিষ নয়। হিস্টরিতে বেশী নম্বর নাই বা পেলাম, তাতে কি আসে যায়?

প্রফেসর বসু একটু খুশী হয়ে বলেন, পরীক্ষায় বেশী নম্বর পাওয়া কিংবা পাস করা আর চাকরি পাওয়ার জন্য শিক্ষা নয়। ব্যক্তিত্ব পাওয়া, চরিত্র পাওয়ার জন্য শিক্ষা।

আমি মাধবের কানে কানে বলি, প্রফেসর বিমল বসুর মত একটি পার্সোনালিটি যদি পেতে পারি, তবে সেটাই কি আমাদের জীবনের কম লাভ রে মাধব?

লাল কাঁকরের পথ ধরে সারবাঁধা দেবদারুর ছায়ায় ছায়ায় পথ হেঁটে এক রবিবারের দুপুরে প্রফেসর বসুর সঙ্গে বেড়িয়ে বেড়িয়ে আমরা যখন টাউনের শেষ ল্যাম্পপোস্টের কাছে এসে পড়েছি, তখন প্রফেসর বসু হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। নিকটেই রাস্তার ওপারে ঘন হাসনুহানার ঘেরানের ভিতর ছোট্ট ও সুন্দর একটি বাংলোবাড়ির দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবতে থাকেন প্রফেসর বসু।

ছোট্ট ওই বাংলোটার নাম সিতারা মঞ্জিল। শহরের বিখ্যাত ধনী হাইড মার্চেন্ট করিম সাহেবের সম্পত্তি। বাড়িটা খালি পড়ে আছে। করিম সাহেব তাঁর বিগতা স্ত্রীর নামে এই সুন্দর ও সুশ্রী মঞ্জিল উৎসর্গ করে দিয়েছেন। শুধু একজন মালী ছাড়া এই মঞ্জিলের সীমানার ভিতর আর কেউ থাকে না। পথের উপরে দাঁড়িয়ে মঞ্জিলের চার পাশের দামাস্কা গোলাপের স্তবক দেখা যায়। ডেপুটি কমিশনার উড সাহেবের জামাই এসে এই মঞ্জিল মাত্র এক মাসের জন্য ভাড়া নিতে চেয়েছিলেন। করিম সাহেব এই সিতারা মঞ্জিলকে একদিনের জন্যও ভাড়া দিতে রাজী হন নি।

সিতারা মঞ্জিলের এই ইতিহাসটুকু আমরা জানতাম, এবং আমরাই সে ইতিহাস প্রফেসর বসুর কাছে বর্ণনা করলাম। শুনে আরও মুগ্ধ হয়ে সিতারা মঞ্জিলের দিকে তাকিয়ে রইলেন প্রফেসর বসু।

তারপর আর বেশীক্ষণ নয়। প্রফেসর বসু বললেন, চল।

টাউনের দিকে আবার ফিরে চললাম। পথ চলতে চলতে প্রফেসর বসু শুধু একটি কথাই বললেন, সম্রাট অশোকের সত্যিকারের গ্রেটনেস কোথায় এবং কিসে, সেটা বুঝতে পেরেছ কি?

ইন্দু বলে, এখনও বুঝতে পারি নি স্যার।

প্রফেসর বসু—পূজেতয়া তু এব পরপাসংডা তেন তেন প্রকরণেন। অন্য সম্প্রদায়কেও বিশেষ বিশেষ কারণে শ্রদ্ধা করা উচিত। গিরনার পাহাড়

থেকে ধৌলি পাহাড় পর্যন্ত কত পাথরের গায়ে এই উপদেশ মানুষের শিক্ষার জন্য উৎকীর্ণ করে গিয়েছেন সম্রাট অশোক।

প্রফেসর বসু সত্যিই মনে-প্রাণে অশোকিস্ট। আমরা আর একটা নতুন প্রমাণ স্বচক্ষেই দেখতে পেলাম। করিম সাহেবের সঙ্গে একই মোটরগাড়িতে চড়ে রোজ সন্ধ্যায় ফকির ইব্রাহিমের কবরে ফুল আর চেরাগ দেবার জন্য চলেছেন প্রফেসর বসু। এবং আর সাতদিন পরেই দেখলাম, মল্লিক বোর্ডিং হাউসের সেই ক্ষুদ্র কক্ষটি ছেড়ে দিয়ে সিতারা মঞ্জিলে গিয়ে আশ্রয় নিলেন প্রফেসর বসু। আমরা আশ্চর্য হলাম। আমাদের আরও আশ্চর্য করে দিয়ে প্রফেসর বসু বললেন, করিম সাহেবের অনুরোধ তুচ্ছ করতে পারলাম না। তিনি আমার কাছ থেকে এক পয়সাও ভাড়া নেবেন না, অথচ আমাকে এখানে থাকতেই হবে। বল দেখি, এমন বিপদেও মানুষে পড়ে?

অশোকিস্ট বিমল বসুর আরও এক-একটি আন্তরিক নিষ্ঠার এইরকমই কীর্তি দেখতে পাব, আমাদের এই আশার কথা আমরা আড়ালে আড়ালে বলাবলি করি। এবং ইতিহাসের ক্লাসেই একদিন আমাদের মনের আশা চমকে দিয়ে প্রফেসর বসু প্রশ্ন করলেন, প্রিয়দর্শী মহারাজ অশোকের সবচেয়ে বেশি সুন্দর মহত্ত্বটি কি তোমরা ঠিক ধরতে পারছ? সন্দেহ, পারছ না। তিনি ছিলেন মহাকরুণার প্রতীক। শুধু মানুষের প্রতি নয়, সর্বজীবের প্রতি তাঁর মন মমতায় ও করুণায় সর্বক্ষণ টলমল করত।

সেদিন ছিল পিঁজরাপোলের গোপাষ্টমীর মেলা। মেলা দেখতে গিয়ে সেই সন্ধ্যাতেই আমরা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম, প্রফেসর বসু একটা খোঁড়া গরুকে নিজের হাতে কচি ঘাস খাওয়াচ্ছেন। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে পিঁজরাপোলের ম্যানেজার হরকিষণলাল প্রফেসর বসুর মুখের দিকে শ্রদ্ধানিবিড় দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে আছেন।

এবং আর দুদিন পরে সকাল বেলা সিতারা মঞ্জিলে গিয়ে ড্রামাটিক ক্লাবের চাঁদা চাইবার জন্য প্রফেসর বসুর কাছে এসে দাঁড়াতেই দেখতে পেলাম, পিঁজরাপোলের দারোয়ান একসের খাঁটি দুধ রেখে দিয়ে চলে গেল।

প্রফেসর বসু বললেন, হরকিষণলাল বড় উপদ্রব শুরু করেছে। রোজই এক সের করে দুধ পাঠাচ্ছে, অথচ দাম নিচ্ছে না।

ফিরে যাবার সময় মাধব দুবার মাথা চুলকে নিয়ে প্রশ্ন করে, তোরা কি রকম বুঝছিস্, ঠিক করে বল্ তো ?

ইন্দু বলে, কি ?

মাধব—এই সব অশোকিজ্‌মের মানেটা কি ?

আমি বাধা দিয়ে বলি, একটু তলিয়ে বুঝতে চেষ্টা কর্ মাধব। চট করে প্রফেসর বসুর মত মানুষকে একটা বাজে সন্দেহ করে বসিস্ না।

মাধব বলে, আরে না না, আমি সম্রাট অশোকের গ্রেটনেসটাই বুঝতে চাইছি, প্রফেসর বসুর কথা বলছি না।

ইন্দু বলে, ওই তো, প্রথম গ্রেটনেস হল অন্য সম্প্রদায়কে শ্রদ্ধা, দ্বিতীয় গ্রেটনেস মহাকরুণা।

মাধব উদাসভাবে বলে, শুধু এইটুকু জানলেই কি হিস্টরিতে পাস করতে পারা যাবে ?

ঠিকই বলেছিস্ মাধব। অশোকের গ্রেটনেস সম্বন্ধে আমাদের জানবার যে আরও অনেক কিছু বাকি আছে, সেটা আমরা আর কদিন পরেই বুঝতে পারলাম।

সেদিন আমাদের ইতিহাসের ক্লাসটাই কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। ক্লাস-ঘরের বাতাসটা যেন ভোরবেলায় ফুলবনের হাওয়ার মত হঠাৎ ফুরফুরে হয়ে গেল, তার মধ্যে অদেখা মধুপের গুঞ্জনও যেন ঘুরে বেড়ায়। এমন অভিনব কোন ঘটনা নয় ; ক্লাসের প্রথম সারি থেকে একটু তফাতে নতুন একটা ডেস্কের কাছে একটি নতুন মুখ দেখা যায়। একটি ছাত্রী।

প্রফেসর বসু ক্লাব-ঘরে ঢুকেই নবাগন্তুকা ছাত্রীর দিকে গম্ভীরভাবে তাকালেন। তারপর প্রশ্ন করার ভঙ্গীতে ডাক দিলেন, স্টেলা হেমব্রাম ?

স্টেলা বলে, ইয়েস সার্।

প্রফেসর বসু—তুমি কোন্ স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করেছ ?

—পালামৌ স্কুল থেকে।

—তোমার দেশ কোথায় ?

—পালামৌ।

—এখানে তোমার কে আছেন ?

—কেউ না।

—তুমি কোথায় থাক ?

—আমি লুথারিয়ান মিশনের হোমে থাকি।

আর প্রশ্ন করলেন না প্রফেসর বসু। ইতিহাস পড়াতে আরম্ভ করলেন প্রফেসর বসু। তাঁর সেদিনের পড়াবার সেই ভঙ্গী, তাঁর বক্তৃতার সেই ভাষা এবং দেবানাং প্রিয় প্রিয়দর্শী মহারাজা অশোকের হৃদয়বত্তা সম্বন্ধে তাঁর সেই স্তব আজও ভুলতে পারি নি।

আমরা দেখে খুশী হলাম, স্টেলা হেমব্রামও মুগ্ধ হয়ে শুনছে প্রফেসর বসুর অদ্ভুত ভাববিভোর বক্তৃতার ভাষা। মনে হল, আমাদের চেয়েও বেশী মুগ্ধ হয়েছে স্টেলা।

আমাদের চেয়ে বয়সে একটু বড়ই হবে স্টেলা। ছিপছিপে শ্যামলা রঙের মেয়ে। ধবধবে সাদা একটা শাড়ি, বড় সুন্দর করে যেন লতিয়ে লতিয়ে স্টেলার ছিপছিপে শরীরটাকে জড়িয়ে ধরে আছে। খোঁপার ছাঁদটাও অদ্ভুত, দুটো মহুয়া ফুল গোঁজা রয়েছে। এখান থেকে পালামৌ অনেক দূর। মনে হয়, সেই দূর পালামৌয়ের এক মহুয়াবনের বুকের ভিতর থেকে পথ-হারানো এক চঞ্চল-চিত্তা হরিণী এখানে এই কলেজের ইতিহাসের ক্লাসের ভিড়ের মধ্যে এসে পড়েছে। ঝরনার জল খায়, আর কচি শালের গায়ে হেলান দিয়ে জংলা চাঁদের দিকে অবাক্ হয়ে তাকিয়ে থাকে, সেই রকমই একটি প্রাণ। পাহাড়ী ডিহির একটা কালো মেয়ে বটে, কিন্তু কী সুন্দর ওর চোখের চাউনি! দাঁতগুলো যেন শুক্তো দিয়ে মাজা, কথা বললে ঝিক করে ঠোঁটের ফাঁকে যেন এক টুকরো জ্যোৎস্না হেসে ওঠে।

বোধ হয় অনেকক্ষণ আমরা আনমনা হয়ে এইসব কথাই ভাবছিলাম। হঠাৎ শুনতে পেলাম প্রফেসর বসু বলছেন, সম্রাট অশোকের সবচেয়ে মহৎ কীর্তি কি? কেন তিনি ইতিহাসের মহত্তম মানুষ? তিনি ছিলেন প্রেমিক। সে প্রেম সেকালের সঙ্কীর্ণ আর্য আভিজাত্যের বন্ধনে বাঁধা ছিল না। তিনি অনার্যকে আপন করে নিয়েছিলাম শুধু মুখের কথায় নয়, প্রেমের উপহারে। সেই বিদিশা নগরের উপান্তে এক অরণ্যময় রাজ্যের এক ভীলকন্যাকে তিনি বিবাহ করেছিলেন।

দেখলাম, স্টেলার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে। রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে স্টেলা আবার প্রফেসার বসুর ভাববিভোর সেই সুশ্রী মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। স্টেলার চোখে একটা ভীরু বিস্ময় যেন ছলছল করে।

চলছে ইতিহাসের ক্লাস। মাত্র ওই একটি দিনই স্টেলার চোখের বিস্ময়টাকে ভীরু-ভীরু মনে হয়েছিল। কিন্তু তারপর আর নয়। প্রফেসর বসুর বক্তৃতা শোনে স্টেলা, যেন বাঁশীর শব্দ শুনছে হরিণী। প্রফেসর বসুও যেভাবে ও যে-ভঙ্গীতে বক্তৃতা করেন, দেখে-শুনে মনে হয় যে, এই ক্লাসের মধ্যে যেন একটি মাত্র শ্রোতা আছে, এবং শুধু তাকেই মুগ্ধ করে দেবার জন্য তিনি বক্তৃতা করছেন। ডু ইউ ফলো স্টেলা? শুধু স্টেলাকেই প্রশ্ন করেন। আমরা কি বুঝলাম বা না বুঝলাম, তার জন্য প্রফেসর বসুর মনে বিশেষ কোন কৌতূহল আগের মত সেরকম কোন প্রশ্ন হয়ে বেজে ওঠে না।

ক্লাসের বাইরেও অবস্থাটা যে এত তাড়াতাড়ি প্রায় এই রকমই অদ্ভুত হয়ে উঠবে, সেটা অনুমান করতে পারি নি। কোন রবিবারের সকালে সিতারা মঞ্জিলে গিয়ে প্রফেসর বসুকে আর দেখতে পাই না। মালী বলে, ভোর হতে না হতেই তিনি দামাস্কা গোলাপের তোড়া হাতে নিয়ে কোথায় যেন গিয়েছেন।

আমরা আশ্চর্য হই। মাধব বলে, হুঁ। ওই সীতাগড় পাহাড়ের গুহার গায়ে তো কোন ব্রাহ্মীলিপি লেখা নেই। শালের জঙ্গলে শুধু উইঢিপি আছে; কোন স্তূপ আর স্তম্ভ তো নেই। ইতিহাসের কোন রহস্য সন্ধানের জন্য দামাস্কা গোলাপের তোড়া হাতে নিয়ে কোথায় কোন্‌দিকে চলে যান প্রফেসর বসু? ইতিহাসের সঙ্গে দামাস্কা গোলাপেরই বা কি সম্পর্ক থাকতে পারে?

ইন্দু বলে, সম্রাট অশোক নিশ্চয়ই গোলাপ ফুল খুব ভালবাসতেন।

মাধব প্রশ্ন করে, তা না হয় হল, কিন্তু গোলাপ ফুল নিয়ে যেতেন কোথায়? কাকে দেবার জন্য?

আমি বলি, আমার মনে হয়, বিদিশার কাছে সেই অরণ্যময় রাজ্যের সেই অনার্যা ভীল মেয়েকেই ফুলের তোড়া উপহার দিতেন প্রিয়দর্শী অশোক।

ভালই তো। কল্পনা করতে ভালই লাগে, যেমন সম্রাট অশোকের উপর তেমনি প্রফেসর বসুর উপরেও আমাদের শ্রদ্ধাটাই আরও বিস্মিত হয়। কত উদার, কত মহৎ, আর কি সুন্দর ওই প্রেমে-ভরা মন! বেচারা স্টেলা, নেহাতই গরিব এক পাহাড়ী ডিহির মেয়ে। খবর পেয়েছি, স্টেলার

বাবা পালামৌ হাসপাতালে কম্পাউণ্ডারের কাজ করেন। স্টেলার সঙ্গে প্রফেসর বসুর যদি বিয়ে হয়ে যায়, তবে সেটা অতি সুন্দর একটা ঐতিহাসিক ব্যাপারই হবে।

হবেই বোধ হয়। তার প্রমাণও পেয়ে গেলাম। ইতিহাসের ক্লাসে নয়, ইংরেজীর ক্লাসে সেদিন একটা ঘটনা সত্যিই একেবারে অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ করে দিল যে, আমরা ঠিকই ধারণা করেছি।

ছোট্ট এক টুকরো কাগজের উপর কয়েকটা অক্ষর—স্টেলা বসু। লিখেছিল রাঁচির সেই দুর্দান্ত হরিপদ। কাগজটা একটা মোড়কের মত ভাঁজ করে, তার পর একবার সাবধানে তাকিয়ে নিয়ে স্টেলার গায়ের উপর ছুঁড়ে দিল হরিপদ। আনমনা স্টেলা চমকে ওঠে। কাগজের মোড়ক খুলে নিয়ে লেখাটা পড়ে। আমাদের বুক ভয়ে দুর-দুর করে। কিন্তু স্টেলার দু'চোখে অদ্ভুত রকমের একটা হাসিমাখা আভা যেন ঝিলিক দিয়ে শিহরিয়ে ওঠে। ঠোঁটের ফাঁকে ধবধবে সাদা দাঁতের জ্যোৎস্না দেখা যায়। কাগজের টুকরোটাকে বইয়ের পাতার ভাঁজের ভিতর রেখে দেয় স্টেলা। লেখাটা যেন ওর জীবনের এক নতুন ইতিহাসের শিলালিপি, যেন অতি সাবধানে, বেশ যত্ন করে আর অনেক মায়া করে কুড়িয়ে নিয়ে সেই লিপিকে বুকের কাছে গোপন করে রাখতে চায় স্টেলা।

কলেজ থেকে বাড়ি ফেরার পথেও এক-একদিন দেখতে পাই, দূরে একটা ইউকালিপটাসের গা ঘেঁষে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে স্টেলা। মনে হয় আনমনা হরিণীর মত থামকা দাঁড়িয়ে আছে স্টেলা। কিংবা হয়তো পাখির ডাক শুনছে, অথবা কাঠবিড়ালীর খেলা দেখছে। তারপরেই বুঝেছি, থামকা নয়, একজনের আসার আশাপথ চেয়ে প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে স্টেলা। সত্যিই, শেষ ক্লাসের পড়ানো শেষ করে দিয়ে প্রফেসর বসু যখন ধীরে ধীরে হেঁটে হেঁটে স্টেলার কাছে এসে দাঁড়ালেন, তখন যেন একটা খুশির মলয় বাতাস লেগে দুলে উঠল স্টেলার সেই ছিপছিপে লতার মত শরীরটা। হেলে দুলে প্রফেসর বসুর সঙ্গেই গল্প করতে করতে চলে গেল স্টেলা।

ভালই তো। মন্দ কি? নিন্দে করবার কি আছে? দেখে বরং খুশী হওয়াই উচিত যে প্রফেসর বসু শুধু মুখের কথায় আদর্শ প্রচার করেন না। প্রিয়দর্শী অশোকের মনের মতই সুন্দর একটি উদার মন পেয়েছেন প্রফেসর বসু, তাই তো স্টেলার মত মেয়েকে ভালবাসতে পেরেছেন!

এখন শুধু প্রশ্ন, কবে শুনতে পাব স্টেলার সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে প্রফেসর বসুর? তারিখটা জানতে পারলে হয়। কারণ আমাদেরও তৈরী হতে হবে, অশোকিষ্ট প্রফেসর বসুর মত মানুষের বিয়েতে যে উপহার মানায়, ঠিক সেই রকম একটি উপহার দিতে হবে। ইন্দু বলে, সবাই মিলে চাঁদা তুলে রূপোর একটা সাঁচিস্তূপ উপহার দিলে কেমন হয়?

মাধব বলে, খুব ভাল হয়।

দেখেছিলাম, প্রফেসর বসুর ঘরের টেবিলের উপর সিমেন্টের তৈরী সাঁচি স্তূপের একটা মডেল আছে। মডেলটাকে দু-চার দিনের জন্য প্রফেসর বসুর কাছে থেকে ধার নেওয়া দরকার; তা হলেই মধু স্যাকরাকে দিয়ে একটা রূপোর সাঁচি গড়িয়ে নিতে পারা যাবে।

শুধু এই উদ্দেশ্য, আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না, আমরা হঠাৎ এক রবিবার সন্ধ্যায় সোজা সিতারা মঞ্জিলে গিয়ে প্রফেসর বসুর-ঘরের দরজায় কড়া নেড়ে হাঁক দিলাম, আমরা এসেছি সার্।

দরজা খুলে দিলেন প্রফেসর বসু, এবং আমরা ঘরে ঢুকেই চমকে উঠলাম, একটা চেয়ারের উপর বসে আছে স্টেলা হেমব্রাম।

মাধব অপ্রস্তুত হয়ে বলে, আমরা তা হলে এখন চলে যাই সার্; না হয় আর একদিন আসব।

প্রফেসর বসু বলেন, হাঁ, আজ যাও। কিন্তু সম্রাট অশোকের জীবনের একটি নীতিকেও জেনে যাও। অশোকের নির্দেশ ছিল, যে-কোন ব্যক্তি যে কোন শুভকাজের দরকারে অবাধে ও স্বচ্ছন্দে তাঁর শয়নঘরের ভেতরেও চলে আসতে পারবে। কোন বাধা ছিল না। তোমরাও আসবে, আজ যেমন স্টেলা তার জীবনের মস্ত একটা দরকারী কথা বলবার জন্য এসেছে।

এতক্ষণ যেন পাথরের চোখের মত স্তব্ধ হয়ে জানালার দিকে তাকিয়ে ছিল স্টেলার চোখ দুটো। হঠাৎ ভয় পেয়েছিল বোধহয়। কিন্তু এইবার ছটফট করে ওঠে, যেন রুমাল দিয়ে চোখ দুটো আড়াল করতে চায় স্টেলা। খোঁপা থেকে আলগা হয়ে টুপ করে একটা ফুল মেঝের উপর ঝরে পড়ে। দেখতে পেলাম, হাসছে স্টেলা। চোরা হাসি, লাজুক হাসি, কিন্তু একেবারে নির্ভয় একটা হাসি।

কি আশ্চর্য, ইতিহাসের ক্লাসে আজ স্টেলাকে দেখতে পাচ্ছি না কেন? শুধু সেদিনই নয়, পর পর আরও কয়েকটা দিন পার হয়ে গেল স্টেলা আর

আসে না। ইংরেজির আর লজিকের ক্লাসেও স্টেলাকে দেখা যায় না।

প্রফেসর বসুর ইতিহাসের বক্তৃতাগুলিও কেমন যেন সুর বদল করছে বলে মনে হয়। কিন্তু সেই একই কথা। প্রিয়দর্শী মহারাজ অশোকের বিরাট ব্যক্তিত্ব, বলিষ্ঠ চরিত্র, মহৎ হৃদয়বত্তা আর অপূর্ব কর্তব্যনিষ্ঠা।

প্রফেসর বসু বললেন, চারুবাবু আবার আমাকে ঠাট্টা করেছেন। আমাকে করিম সাহেবের সঙ্গে এক টেবিলে বসে মুরগি খেতে দেখে ঠাট্টা করেছেন, এ কেমন অশোকিজ্‌ম? কিন্তু চারুবাবু জানেন না যে, অশোক ময়ূরের মাংস খেতেন, এবং পাণিনির টীকাকার ক্যাতায়নের মতে মোরগ হল ময়ূরবর্গের পাখি।

বলতে বলতে প্রফেসর বসুর বক্তৃতার স্বর যেন আরও গম্ভীর এবং আরও গভীর হয়ে গেল।—যারা ইতিহাসের কিছুই জানে না, তারাই বুঝতে এই ভুল করে। প্রিয়দর্শী অশোকের জীবনের নীতিকেও অনেকে বুঝতে ভুল করে। তারা জানে না যে, প্রিয়দর্শী অশোক ছিলেন বাইরে কোমল, কিন্তু ভিতরে রুদ্র। কর্তব্যের চেয়ে বড় তাঁর কাছে আর কিছুই ছিল না। কর্তব্যের জন্য তিনি হত্যার নির্দেশ দিতেও দ্বিধা করতেন না। অশোকের গিরিলিপি বলে, য়ো পি চ অপকরেয় তি ছমি হবিয়মতে বো দেবনং পিয়সয়ং শকো ছমনয়ে—যদি কেউ আমার অপকার করে তবে যতক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমা করা চলে ততক্ষণই আমি তাকে ক্ষমা করব।

বোধ হয় চারুবাবুকে আর ক্ষমা করা চলে না, চারুবাবুকে একটা শিক্ষা দিতে চান প্রফেসর বসু। কিন্তু বুঝতে পারি না, চারুবাবুর ঐ সব ঠাট্টায় কি এমন ভয়ানক অপকার হয়েছে প্রফেসর বসুর?

কিন্তু এ কি? এ সব আবার কি বলছেন প্রফেসর বসু? কী অদ্ভুত কথা —প্রিয়দর্শী মহারাজ অশোকের জীবনের সে এক চরম পরীক্ষা। পাটলি-পুত্র তাঁকে ডাকছে, কর্তব্যের ডাক। কিন্তু বিদিশার নিকটে অরণ্যখণ্ডের সেই অনার্যা ভীল নারীই তাঁর জীবনের বাধা হয়ে উঠল। সেই বাধাকে অনেক দিন ধরে ক্ষমা করলেন অশোক, কিন্তু যখন আর ক্ষমা করা চলে না তখনই তিনি চলে গেলেন, এবং জীবনে আর তার কাছে ফিরে আসেন নি।

ঘণ্টা বেজে উঠল। হনহন করে হেঁটে ক্লাস ছেড়ে চলে গেলেন প্রফেসর বসু।

রূপোর সাঁচি-স্তূপ তৈরী করবার দরকার হবে কি হবে না, ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। বেশ একটু দুর্ভাবনা নিয়ে সিতারা মঞ্জিলের দিকে আমরা এগিয়ে যাচ্ছিলাম। ফটকের কাছে পৌঁছতেই দেখি, সেই স্টেলা হেমব্রাম আস্তে আস্তে হেঁটে সিতারা মঞ্জিলের ভিতর থেকে বের হয়ে আসছে। আমাদের দেখতে পেয়েই থমকে দাঁড়াল স্টেলা। রুমাল দিয়ে যেন শক্ত করে চোখ দুটোকে চেপে রইল। কি ব্যাপার? স্টেলার ঠোঁটের ফাঁকে সাদা দাঁতের জ্যোৎস্না কেন হেসে ওঠে না? খোঁপাতে ফুল নেই কেন? থরথর করে কাঁপছে কেন ওর ছিপছিপে লতার মত শরীরটা?

আমরা কোন প্রশ্ন করবার আগেই আস্তে আস্তে হাঁপাতে হাঁপাতে ক্লান্ত রোগীর মত চলে গেল স্টেলা।

সিতারা মঞ্জিলের ফটক পার হয়ে ভিতরে ঢুকতে চেঁচিয়ে উঠল মালী, মাস্টার সাহেব নেহি হ্যায়।

মাধব—তার মানে? কোথায় গিয়েছেন মাস্টার সাহেব?

মালী বলে, কলকত্তা।

আশ্চর্য হলাম, কিন্তু আরও একটু আশ্চর্য হওয়া বাকি ছিল। সেদিন চারুবাবুর বাংলা ক্লাসই আমাদের মনের সব প্রশ্নগুলিকে যেন একটা আছাড় দিয়ে গুঁড়ো করে দিল।

পড়াতে গিয়ে হাসছিলেন চারুবাবু এবং আমাদের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলেন, গ্রেট ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল প্রফেসর বসুর খবর শুনেছ তো?

—কিছুই শুনি নি সার্।

—তাঁর বিয়ে। কলকাতার এক মস্ত বড় লোকের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে। মেয়ের বাপের সব সম্পত্তি যৌতুক পাবেন প্রফেসর বসু। তাই আড়াই শো টাকা মাইনের মাস্টারি ছেড়ে দিয়ে চলে গিয়েছেন।

ইন্দু ফিসফিস করে মাধবের কানের কাছে বলে—এ কি কাণ্ড? কিছু বুঝতে পারছিস মাধব?

মাধব বলে, খুব বুঝেছি।

ইন্দু—কি?

মাধব—পাটলিপুত্রের সেই অশোকটা হুবহু ওই বিমলেটারই মত গ্রেট ম্যান।

## পরিপূর্ণা

রাত দশটারও বেশী হয়ে গিয়েছে বলে মনে হয়। ক্লান্ত বাড়িটার মেজাজও যেন ক্লান্ত হয়েছে। সুলতার বিয়ে হয়ে গিয়েছে। বর-বউ বাসর-ঘরে গিয়েছে। খাওয়া-দাওয়ার হুল্লোড়ও আর নেই। নিমন্ত্রিতদের প্রায় সবাই চলে গিয়েছে। যারা আছে তারা পাড়ারই লোক।

এখন শুধু সামিয়ানার নীচে এলোমেলো ক'রে ছড়ানো খালি চেয়ার-গুলির ওপর এলোমেলো বসে গল্প করছে ওরাই যারা বিয়ে বাড়ির কাজে খেটে খেটে ক্লান্ত হয়েছে। ওরা সবাই সুলতার দাদার বন্ধু। এদিকে বেশ একটু তফাতে চেয়ারে বসে আনমনা হয়েও মাঝে মাঝে ওদেরই নানা গল্পের নানা কথা শুনছিল কুমুদ রায়।

বাসর-ঘরের দিক থেকে খল-খল আর খিল-খিল হাসির শব্দ যেন বসন্ত-কালের মিষ্টি তুফানী হাওয়ার শব্দের মতো মাঝে মাঝে ভেসে আসে। ওরা বলে—ঐ শোন এখানেও আবার বোধ হয় সেই রকমেরই কাণ্ড করছে জয়ন্তী সেন।

জয়ন্তী সেন? নামটা শুনেই চমকে ওঠে কুমুদ রায়। জয়ন্তী সেনের নাম শুনে কুমুদ রায়ের পক্ষে একটু চমকে ওঠবারই কথা। কিন্তু এরা যে জয়ন্তী সেনের কথা বলছে, সে কি সেই জয়ন্তী সেন, যাকে কুমুদ সেই ভয়ঙ্কর দাঙ্গার সময় মানিকতলার পথে একা দেখতে পেয়ে আর অভয় দিয়ে নিরাপদে এই ঢাকুরিয়া পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিল?

সে জয়ন্তী সেনের সঙ্গে এখনও মাঝে মাঝে কুমুদের দেখা হয়। ঠিকই, পথে মুখোমুখি হলেও সেই আগের মত অত হাসিখুশি হয়ে আর আলাপ করে না জয়ন্তী। কিন্তু একেবারে বোবা হয়ে পাশ কাটিয়ে চলেও যায় না। কম কথা বললেও কথা বলে। শুকনো হাসি হলেও একটু হাসে। সেদিন সন্ধ্যায় গড়িয়াহাটার মোড়ে ফুটপাথের ওপর বিছানো ফুলের এক খোলা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে রজনীগন্ধার দর করছিল জয়ন্তী। অফিস থেকে ফেরার পথে কুমুদ সেই সময়ে ট্রাম থেকে নেমে মোড়ের কাছে দাঁড়ালো। কুমুদের দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠলো জয়ন্তী। যেন লজ্জা পেয়ে চমকে

ওঠা। ভয় পেয়েও হতে পারে। কিন্তু কিসের ভয় আর কিসের লজ্জা? বরং কুমুদেরই পক্ষে লজ্জিত হওয়া উচিত। একদিন এসে শুধু একটু চা খেয়ে যাবার জন্য কুমুদকে অনুরোধ করেছিল জয়ন্তী। আজ যাব কাল যাব করতে করতে এই তিন বছরের মধ্যেও আর একবার গিয়ে জয়ন্তীদের বাড়ির এক কাপ চা খেয়ে আসবারও সময় হলো না। কে জানে কি মনে করলো জয়ন্তী!

সব ঘটনার ইতিহাস এত স্পষ্ট মনে পড়ে, সময়ে-অসময়ে হঠাৎ মনেও পড়ে যায়, তবু কি আশ্চর্য, আর একবার এসে চা খেয়ে যাবার জন্য জয়ন্তীর সেই আগ্রহভরা একটা অনুরোধের দাবী আজও রক্ষা করতে পারা গেল না কেন? সময়ের অভাব তো নেই। বেশ তো মাসে অন্তত একবার সিনেমা হাউসে গিয়ে বাজে ছবি দেখবারও সময় পাওয়া যায়। অথচ যে মেয়েকে একেবারে ভুলে যাওয়া আজও সম্ভব হলো না, এমনকি হঠাৎ অকারণেই এক একবার দেখতে বড় ইচ্ছা করে, সেই মেয়ের একটা অনুরোধ তুচ্ছ হয়ে গেল কেমন করে? সেই অনুরোধটাকেই কি খুব ভয় করে কুমুদ রায়?

এই ত্রিশ বছর বয়সের জীবনে অনেক মুখ থেকেই চা খাওয়ার জন্য অনুরোধ শোনবার সৌভাগ্য হয়েছে কুমুদ রায়ের। সেই সব মুখের অনেক-গুলিই তো জয়ন্তীর চেয়ে অনেক বেশী সুন্দর। কিন্তু সামান্য একটু চা খেয়ে যাবার জন্য অনুরোধের রূপটাই যে কত সুন্দর হতে পারে, সেই সত্য জীবনে মাত্র একজনের মুখের দিকে তাকিয়ে মাত্র একটি দিনই অনুভব করতে পেরেছিল কুমুদ রায়।

কলকাতা সহরের চারিদিক জুড়ে আর সহরের ভিতরেও তখন এখানে-ওখানে খুনিয়ারা দাঙ্গার মাতামাতি আর পাড়া-পোড়ানো আগুনের জ্বালা জ্বলছে। পথ চলা নিষেধ ক'রে দিয়ে যখন-তখন কার্ফ্যু জারী করছে পুলিশ। শ্যামবাজারের মামার বাড়ি থেকে বের হয়ে বাস ধরবার আশায় এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে যখন মানিকতলার মোড়ের আগুন দেখতে পেয়ে ভয়ে থরথর করে উঠেছে জয়ন্তীর সারা শরীর, ঠিক সেই সময়েই পথের ওপর পিছন থেকে কে যেন ডাকে—আপনি এই হাঙ্গামার মধ্যে ওদিকে কোথায় চলেছেন?

যেন ভয়-ভাঙ্গানো দৈবের ডাক। চমকে মুখ ফিরিয়ে, আর ঢাকুরিয়ারই

কুমুদ রায়কে দেখতে পেয়ে জয়ন্তীর দু'চোখের ভয়ের ঘোর কেটে যায়। জয়ন্তী বলে—আমি ঢাকুরিয়া যেতে চাই কুমুদবাবু।

কুমুদ বলে—আমার সঙ্গে চলুন, আমিও ঢাকুরিয়া যাচ্ছি।

ঢাকুরিয়ার আর পাঁচজনের মত জয়ন্তীও কুমুদকে চেনে। হরিশ রায়ের ছেলে কুমুদ রায়, যাদের বাগানে প্রতি বছর সর্বজনীন দুর্গোৎসবের ঘটা সাত দিন পর্যন্ত চলে। ঐ সর্বজনীন আনন্দের অর্ধেক খরচ হরিশবাবুই দিয়ে থাকেন। দেবেনই বা না কেন? খুব বড়লোক তো নন। কুমুদের চাকরিটাও ভাল, মস্ত বড় এক জুট মিলের ওয়েলফেয়ার অফিসার। এখনও বিয়ে হয়নি কুমুদের। পাড়ার লোক মনে করে, নিশ্চয়ই কোন ব্যাপার আছে। প্রেম-ট্রেমেরই ব্যাপার বোধ হয়, যার জন্য কুমুদ আজও বিয়ে না করে দিব্যি দিন কাটিয়ে দিচ্ছে।

ঢাকুরিয়ার আর পাঁচজনের মত কুমুদও জয়ন্তীকে চেনে। কোন এক প্রেসে প্রুফ-রীডারের কাজ করেন বিলাসবাবু, তাঁরই মেয়ে জয়ন্তী। কে জানে কত মাইনে পান বিলাসবাবু! ওভারটাইম খেটে মাইনের উপরন্তু কিছু আয় হয়। তাতে শুধু দিন চলে যায়, কিন্তু জীবন বোধ হয় চলে না। অনেকগুলি ছেলেপিলে, কোনটিকেই আজ পর্যন্ত স্কুলে পড়াতে পারলেন না। শুধু ঐ জয়ন্তী, দেনা-টেনা করেও জয়ন্তীকে কলেজ পর্যন্ত, অর্থাৎ ঐ আই-এ'র ফার্ষ্ট ইয়ার পর্যন্ত পড়িয়েছিলেন; তারপর আর নয়। অনেকেই জানে, এবং কার কাছ থেকে যেন কুমুদও কথাটা শুনেছিল, দেশের বাড়ি বেচে দিয়ে মেয়ের বিয়ের জন্য টাকা মজুত করে রেখেছেন বিলাসবাবু। কিন্তু কই? আজও তো বিয়ে হলো না জয়ন্তীর। তবে কি টাকাগুলো সব ফুলুরী খেয়েই ফুঁকে দিলে বিলাসবাবু? পাড়ার লোকে জানে, সকালবেলা শুধু দু'আনার ফুলুরী খেয়ে চাকরী করতে বের হয়ে যান প্রুফ-রীডার বিলাসবাবু।

রাস্তার এই ফুটপাথে কার্ফ্যু, ঐ ফুটপাথে কার্ফ্যু নেই। বেশ হিসাব করে পথ চলতে হয়। একটা দোকানের সামনে দুটো লাস পড়ে আছে, ভয়ঙ্কর হুল্লোড় তুলে একদল লোক দোকান ভাঙছে। শিউরে ওঠে জয়ন্তী, ভয় পেয়ে থমকে দাঁড়ায়। এক হাত বাড়িয়ে খপ ক'রে জয়ন্তীর একটা হাত ধরে ফেলে কুমুদ—ভয় পাবেন না, তাড়াতাড়ি হেঁটে চলুন।

যেন কতদিনের চেনা বন্ধু আর বান্ধবী। জয়ন্তীর হাতটা পরম নির্ভর

আর নিরাপদ হয়ে কুমুদের হাতের মুঠোয় বাঁধা পড়ে আছে। তাড়াতাড়ি হাঁটে আর হাঁপায় জয়ন্তী, আর হঠাৎ কেমন যেন আক্ষেপের মত স্বরে বলে ওঠে—উঃ, আপনি আমার চেয়ে কত বড়, তবু আমাকে আপনি করে বলছেন কেন?

কুমুদ হাসে। হাওড়ার পোলের মুখে এসে পৌছতেই কুমুদ বলে—হাঁটতে তোমার বড় কষ্ট হচ্ছে জয়ন্তী, একটা ট্যাক্সি ডাকি, কেমন?

ট্যাক্সিওয়ালা বলে—ঢাকুরিয়া যেতে একশো টাকা।

মুখ কালো করে জয়ন্তী বলে—এত টাকা দিতে পারবো না কুমুদবাবু। হেঁটেই চলুন।

কুমুদ—ট্যাক্সিভাড়া আমি দেব।

চেঁচিয়ে উঠে জয়ন্তী—না, না, না, ছিঃ, আমার একটু কষ্টের জন্যে একশো' টাকা খরচ হবে, কি যে বলেন আপনি!

বিকেলও পার হয়ে গিয়েছে। ঢাকুরিয়া পৌছতে হলো সন্ধ্যা। অর্ধেক আস্ত আর অর্ধেক ভাঙা, কলাগাছে ঘেরা একটা বাড়ি। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে হাঁপ ছেড়ে কুমুদ হেসে হেসে বলে—বাড়ির মেয়ে এইবার বাড়িতে যান, আমি চলি।

কোন কথা বলে না জয়ন্তী। এতক্ষণের এত ভয়, উদ্বেগ, পথ চলার কষ্ট আর আতঙ্ক, তবু যেন কিসের ছোয়ায় সবই স্নিগ্ধ ও মধুর হ'য়ে উঠেছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে সব যেন শূন্য হয়ে যাচ্ছে, চলে যাচ্ছে কুমুদ রায়। তাকে আর একটা মিনিটও এখানে থামিয়ে রাখবার কোন অর্থ হয় না। কুমুদ রায় জয়ন্তী সেনের কেউ নয়।

কুমুদ বলে—কি? কথা বলছো না যে জয়ন্তী?

জয়ন্তী—একটু বেস্ট নিয়ে, তারপর যদি যেতেন…।

কুমুদ—না, আমার জন্যেও বাড়ির সবাই বোধ হয় এতক্ষণে দুশ্চিন্তায় ছটফট করছে, যাই সশরীরে দেখা দিয়ে তাদের নিশ্চিন্ত করে দিই।

জয়ন্তী—কিন্তু…

জয়ন্তীর মুখের দিকে তাকিয়ে একটু আশ্চর্য হয় কুমুদ। কিন্তু কি? এর মধ্যে আর কিন্তু থাকবার তো কথা নেই। হঠাৎ পথের একটা আলাপ, কয়েক ঘণ্টা শুধু একসঙ্গে পথ চলার পালা এই তো এখানে

এসে শেষ হয়ে গেল। আর এখানে আসবার কোন দরকার কোন দিন হবে না। কিন্তু কি বলতে চায় জয়ন্তী?

জয়ন্তী বলে—কিন্তু আপনি তো আর কোন দিন এখানে আসবেন না।

কুমুদ বলে—তা, তা, আসতে পারি হয় তো, কিন্তু কেন, কিসের জন্যে?

জয়ন্তী বলে—আর একদিন এসে চা খেয়ে যাবেন।

বলতে বলতে কেঁপে হাঁপিয়ে কেমনতর হয়ে যায় জয়ন্তীর শরীরটা। চোখ দুটো যেন নতুন করে ভয় পেয়ে শিউরে উঠছে। সারা মুখ জুড়ে যেন চমকে ওঠা রক্তের এক ঝলক আভা ছড়িয়ে পড়েছে। হাসতে চেষ্টা করছে জয়ন্তী, কিন্তু ভীরু চোখ দুটো চলছলিয়ে উঠছে।

দেখতে অদ্ভুত, বেশ তো সুন্দর, রোদ-বৃষ্টির খেলা মত একটি ছবি। জয়ন্তীর মুখের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে কুমুদ। মনে হয়, এই অনুরোধের ডাকে আর একবার আসাই তো উচিত। গেলে ক্ষতি কি?

কুমুদ বলে—আসবো বই কি!

চলে গেল কুমুদ। তারপর আরও কতবার জয়ন্তীর সঙ্গে দেখা হয়েছে। দেখা হতেই একটু অপ্রস্তুত হয়ে কুমুদ বলে—মনে আছে জয়ন্তী। যাব, একদিন যাব নিশ্চয়ই। কাজের ফাঁকে একটু সময় পেলেই যাব।

জয়ন্তীর একটা উত্তর শুনে একদিন সত্যিই লজ্জা পেয়েছিল কুমুদ—সত্যিই কি কোনদিন আপনার সময় হবে?

যেন জয়ন্তীর জীবনের ছোট একটি আশাও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সন্দেহ দেখা দিয়েছে জয়ন্তীর মনে। কিসের সন্দেহ? কলাগাছে ঘেরা একটা অর্ধেক আস্ত আর অর্ধেক ভাঙা বাড়ির আহ্বানকে এমন কিছু দামী বস্তু বলে মনে করে না চারশো' টাকা মাইনের ওয়েলফেয়ার অফিসার, জয়ন্তী কি সত্যিই এইরকম একটা সন্দেহ করে বসলো?

কিন্তু কুমুদ জানে, নিজের মনের কাছে তো, ফাঁকি দিয়ে কোন লাভ নেই, অনেকবার যেতে ইচ্ছা করেছে। কিন্তু ভয়, গেলে কি জয়ন্তীর কোন ক্ষতি হয়ে যাবে না? একবার যাবার পর যদি বারবার যেতে হয়, যদি জয়ন্তী ভুল করে মনে করে ফেলে যে, কুমুদ তাকে দেখবার জন্যই আসছে? না যাওয়াই ভাল। যাওয়াও আর হয়নি। কি ভাবলো, কি মনে করলো জয়ন্তী, তা জয়ন্তীই জানে!

কিন্তু ওরা কি সেই জয়ন্তী সেনের কথা বলছে? ভাল করে শুনতে আর বুঝতে চেষ্টা করে কুমুদ।

হ্যাঁ, সেই জয়ন্তী সেনের কথাই ওরা বলছে। বিলাসবাবুর মেয়ে জয়ন্তী। কিন্তু এ কিরকম অদ্ভুত, ভয়ানক, বেহায়া, নির্লজ্জ জয়ন্তীর কথা!

বাসর-ঘরের দিক থেকে খিলখিল হাসির উচ্ছ্বসিত শব্দ আবার ভেসে আসে। ওরা বলে—হ্যাঁ, ব্যাপারটা হাস্যকর হলেও একটা ট্র্যাজেডি। মেয়েটার আজও বিয়ে হোল না, কোনদিন হবেও না, কোন ভরসা নেই, তাই তো এরকম হন্যে হয়ে পরের বাসর-ঘরে ঢুকে · ···

—এই নিয়ে বারবার তিনবার দেখা গেল। একবার নিতাই-এর বোন সুধার বিয়েতে দেখেছি, আর দু'বার শ্যামলবাবুর দুই মেয়ে নিভা আর শোভার বিয়েতে। বাসর-ঘরে ঢুকে বরের সঙ্গে সে যে কি ঢলাঢলি, কাণ্ড দেখে আর সব মেয়ে শেষে লজ্জা পেয়ে ঘর ছেড়ে চলেই গেল।

—বাস্তবিক, জয়ন্তী সেনের বাহাদুরী আছে বলতে হবে। বাসর-ঘরের আমোদ জমাতে ওরকম ওস্তাদ মেয়ে আমি আর দ্বিতীয়টি দেখিনি। কিন্তু একটু মাত্রা ছাড়া; চিরুণী হাতে নিয়ে শোভার বরের, সেই গোবেচারা ভদ্রলোকের পাট-করা চুলের টেড়ি পালটে দিয়ে দিব্যি চেঁচিয়ে উঠলো জয়ন্তী সেন—এইবার ভাল করে দেখ শোভা, বর পছন্দ হয় কিনা।

শোভার মাসিমা একটু রাগই করেছিলেন—দেখিস, বরের কোলের ওপর যেন বসে পড়িস না জয়ন্তী।

হেসে চেঁচিয়ে ওঠে জয়ন্তী—তাতে কি আর ক্ষতিটা হবে মাসিমা? শোভা একটা বেশ ভাল সতীন পেয়ে যাবে।

বস্, দূর ছাই, কি যে বলে জয়ন্তীটা! মেয়েরা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ফিসফিস করে ওঠে।

—সুধার বিয়ের সময় বাসর-ঘরে বরের সঙ্গে গলা মিলিয়ে ডুয়েট গেয়েছিল জয়ন্তী, গানটাও আবার একটা বেহায়া প্রেমের গান। তাও ভাল ছিল, কিন্তু যখন বরকে অবিরত চিমটি কেটে অস্থির ক'রে তুললো জয়ন্তী, তখন অমন মুখচোরা মেয়ে সুধাও চুপ করে থাকতে পারেনি।

—কি বললে সুধা?

—সুধা বললে, এবার একটু থাম তো জয়ন্তী। তোর চিমটিগুলোও গুড়মাখানো নয়।

—জয়ন্তী কি বললে ?

—জয়ন্তী বেপরোয়া হেসে চেঁচিয়ে উঠলো, নিশ্চয়ই গুড মাখানো, জিজ্ঞেস ক'রে দেখ তোর বরকে !

বাসর-ঘরের দিক থেকে আর খিলখিল হাসির স্বর অনেকক্ষণ হলো ভেসে আসে না। বাসর-ঘরটা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল কেন ?

শুনতে পায় কুমুদ, ওরা তখন বলছে—এ একটা ভয়ের ব্যাপার হয়ে উঠেছে। কারও বাসর-ঘরের দরজায় জয়ন্তীকে দেখলেই সবাই একটু ঘাবড়ে যায়। হলোই বা বাসর-ঘর, একটা অবিবাহিত বয়স্ক মেয়ে পরের বর নিয়ে এরকম ঘাঁটাঘাঁটি করবে, কনে আর কনের বাড়ীর লোকেরা পছন্দ করবে কেন ? তাই সকলে সাবধান হয়ে গিয়েছে। সুলতার বৌদি বলেছেন, এ-বাড়ীতে জয়ন্তীর ওসব বিশ্রী ফষ্টি-নষ্টি চলবে না। বাড়াবাড়ি করে তো থামিয়ে দেওয়া হবে।

আর নয়, উঠে দাঁড়ায় কুমুদ রায়। এতক্ষণ ধ'রে যেন এক ভয়ানক জুয়াচুরির কাহিনী শুনছিল কুমুদ রায়। যেন একটা স্বপ্নের ফুল হঠাৎ কয়লা হয়ে ঝরে পড়ছে। সেই শান্ত লাজুক আর চোখ ছলছল জয়ন্তী সেন একটা নিষ্ঠুর মিথ্যা ! যাক্, খুব ভাল হয়েছে, ঐ গিল্টি-করা চরিত্রের মেয়ের একটা অনুরোধের জালে ধরা পরেনি কুমুদ রায়।

চলেই যাচ্ছিল কুমুদ রায়, কিন্তু থমকে দাঁড়ায়। বিয়ে বাড়ীর ভিতরে হঠাৎ কেমন যেন একটা গভীর ব্যস্ততা জেগে উঠেছে। যারা সামিয়ানার নীচে বসে গল্প করছিল, তারাও হঠাৎ চমকে উঠে ভিতরে চলে গেল। শুনতে পায় কুমুদ, একটা হাসি-হাসি কথা কাটাকাটি যেন আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে। সুলতার বৌদি জয়ন্তীর হাত ধরে হাসতে হাসতে আসছেন। বৌদির মুখের হাসিটিও কেমন যেন, বেশ চতুর অথচ বেশ শক্ত।

বৌদি বলেন—অনেক করেছ ভাই জয়ন্তী, আর কেন ? নিজের বরের জন্যে একটু রাখ, সব ফুরিয়ে দিচ্ছ কেন ?

জয়ন্তী হাসে, কেমন যেন জ্বলন্ত সেই হাসি।—একটুও ফুরিয়ে দিইনি বৌদি, সব জমা আছে।

বৌদি হাসেন—খুব ভাল কথা। তা এখন অনেক রাত তো হলো, বাড়ী যেতে চাও তো একটা গাড়ী ডেকে দিই।

জয়ন্তী হাসে—হাত ধরে গল্প করতে করতে যখন গেট পর্যন্ত নিয়ে এসেছেন তখন বাড়ী না যাওয়া ছাড়া উপায় কি ?

ঠিক হয়েছে, এই রকমই অপমান ঐ মেয়ের জীবনে উপযুক্ত উপহার। সামিয়ানার নীচে এক কোণে দাঁড়িয়ে জয়ন্তীর মুখটার দিকে তাকিয়ে দুঃসহ ঘৃণায় জ্বলে ওঠে কুমুদ রায়ের চোখ।

কুমুদকে দেখতে পেয়েছে জয়ন্তী। চমকে ওঠে জয়ন্তী, তার পরেই যেন গেটের বাইরের অন্ধকারের মধ্যে মিশে যাবার জন্যে ছুটে চলে যায়।

আর কুমুদ রায়ও যেন সেই মুহূর্তে তার ঘৃণার জ্বালা শান্ত করার জন্য বাইরেব বাতাস পাওয়ার আশায় ছুটে বের হয়ে যায়।

কিন্তু শান্ত হয় না সেই ঘৃণার জ্বালা! পথের আলো অন্ধকার আর বাতাস সবই যেন তেতে রয়েছে। তার চোখের সম্মুখ দিয়ে ছায়ামূর্তির মত হন্‌হন্ ক'রে হেঁটে চলে যাচ্ছে যে, সেই তো সেই জয়ন্তী সেন।—জয়ন্তী! হঠাৎ ডেকে ওঠে কুমুদ।

জয়ন্তী দাঁড়ায়। কুমুদ কাছে এগিয়ে এসে বলে—ইচ্ছে ছিল না, তবু একটা কথা না জিজ্ঞেস করে থাকতে পারছি না।

জয়ন্তী বলে—বলুন।

—তোমার এ-দশা হলো কেন ?

—কি ?

—এই যে, যার জন্যে সুলতার বৌদি আজ তোমাকে তাড়িয়ে দিতে বাধ্য হলেন।

জয়ন্তী হাসে—মানুষের বাসর-ঘরে ঢুকে বেহায়ার মত হৈ হৈ করি বলে ?

কুমুদ—হ্যাঁ ?

জয়ন্তী আরও হাসে—একটু থিয়েটার করি কিন্তু তাতেই ওরা কত ভয় পেয়ে যায়। ভয় পাইয়ে মজা দেখি, এই মাত্র। আপনি কি মনে করেন যে···।

কুমুদ চেঁচিয়ে ওঠে।—জঘন্য থিয়েটার। ওগুলো তোমার মনের একটা লোভের খেলা।

জয়ন্তীর অমন কালো চোখের নরম ভুরুও বেঁকে শক্ত হয়ে ওঠে।—হয়তো তাই, কিন্তু তাতে আপনার কি ?

হঠাৎ মুসড়ে পড়ে কুমুদ রায়ের যত রাগী ঘৃণার অহঙ্কার। বড় শক্ত প্রশ্ন করেছে জয়ন্তী, প্রশ্নটা যেন কুমুদ রায়ের গলায় গিয়ে বিঁধেছে, উত্তর দিতে পারে না কুমুদ।

জয়ন্তীর হাসিটা হঠাৎ আরও তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।—যদি বিলাসবাবুর মেয়ে না হয়ে ধরুন আপনারই বাড়ির মেয়ে ঐ থিয়েটার করতো, তবে আপনারা তাকে কি বলতেন বলুন তো?

কুমুদ—কি বলতাম?

জয়ন্তী—বলতেন, কী সুন্দর মিশুকে মেয়ে।

আর একটা আঘাত, যেন এই পৃথিবীরই সব অহঙ্কারে ভদ্রতার মাথায় ভয়ানক এক ঠাট্টার আঘাত করেছে জয়ন্তী। বিব্রতভাবে কুমুদ বলে—তা নয় বোধ হয়।

আর কোন কথা না বলে চলতে সুরু করে জয়ন্তী। কুমুদ বলে—আর একটা কথা শোন। তুমি বোধ হয় আমার ওপর রাগ করে আছ।

জয়ন্তী আশ্চর্য হয়—আপনার ওপর রাগ করবো কেন?

কুমুদ—তোমার সেই নেমন্তন্ন ত জ পর্যন্ত।

হেসে ফেলে জয়ন্তী- আপনি আমাকে খুবই ভুল বুঝেছেন কুমুদবাবু। আপনার ওপর রাগ করবো কোন সাহসে? আপনি এলে খুবই খুশি হতাম কিন্তু আসতে পারেন নি বলেও কোন দুঃখ নেই।

কুমুদের মনের বিরাট একটা বিশ্বাসের পাহাড়কে যেন অবাধে একটা টোকা দিয়ে অনায়াসে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে জয়ন্তী। জয়ন্তীর মনে তাহলে কোন দুঃখ নেই, কুমুদের জন্য কোন মুহূর্তেও পথের দিকে তাকিয়ে প্রতীক্ষা করেনি। কোন আশা করেনি জয়ন্তী, একটুও ব্যাকুল হয়নি জয়ন্তী। এই তিন বছরের হৃদয়টার সবই তাহলে শূন্য।

বোধ হয় এই শূন্যতারই বিদ্রূপ সহ্য করতে না পেরে কুমুদের গলার স্বরটাও তপ্ত হয়ে বিদ্রূপ করে—বাঃ।

আবার আশ্চর্য হয় জয়ন্তী। কুমুদের চোখ দুটো ছটফট করছে। কি কঠোর এই দৃষ্টির ভঙ্গী, যেন শত্রুর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে কুমুদ রায়। জয়ন্তী বলে—আমি যাই।

কুমুদের গলার ভিতর থেকে যেন একটা বদ্ধ আক্রোশ খানখান্ হয়ে ফেটে পড়ে—তোমাকে খুবই ভুল বুঝেছিলাম জয়ন্তী। ঠিকই বলেছেন

সুলতার বৌদি, তোমার সবই ফুরিয়ে গিয়েছে। পরের বাসর-ঘরে ঢুকে থিয়েটার ক'রে ক'রে সবই ফুরিয়ে দিয়েছ।

জয়ন্তী—কিছুই ফুরিয়ে যায় নি, সব জমা আছে। যার চোখ নেই সে-ই শুধু দেখতে পায় না।

বলতে বলতে জয়ন্তীর দু'চোখে যেন অদ্ভুত এক জ্বালা ঠিকরে ওঠে; তার পরেই একেবারে গলে যায়। শিশিরমাখা কালো পাথরের মত চিকচিক করে জয়ন্তীর জলভরা কালো চোখ।

আর ভাবতে পারেনি, বোধ হয় হাতটাকে সামলাতেও পারেনি কুমুদ। জয়ন্তীর একটা হাত শক্ত করে ধরে ফেলে কুমুদ—তোমাকে একটুও ভুল বুঝিনি।

জয়ন্তী—তাহলে একদিনের জন্যেও আসতে পারেন নি কেন? বিলাস-বাবুর মেয়ে ভালবেসে ফেলবে, সেই ভয়ে?

কুমুদ হাসে—না। বিলাসবাবুর মেয়েকে ভালবেসে ফেলবো, শুধু এই ভয়ে।

জয়ন্তী—আজ ভয় করছে না?

কুমুদ—ভয় করছে, যদি এখনি হাত ছাড়িয়ে নাও।·· চল, তোমার বাড়ি পর্যন্ত যাই।

এটা একটা আশ্চর্য বিয়ে; সেই বিয়ের বাসর-ঘরে কি যে আশ্চর্য ব্যাপার হবে, ভেবে কুল পায় না অনেকেই। একে তো জয়ন্তীর মত ঢলানি মেয়ের বিয়ে, তায় কুমুদের মত বর। কলাগাছে ঘেরা অর্ধেক আস্ত আর অর্ধেক ভাঙা বাড়ির এক উৎসবের রাতে বাসর-ঘরের ভিতরে আর কাছে এসে যারা ভিড় করলো, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী চঞ্চল হয়ে উঠলো সুলতা, শোভা, নিভা আর সুধা, সেই সঙ্গে সুলতার বৌদিও। কুমুদের সঙ্গে জয়ন্তীর বিয়ে, জয়ন্তীর সৌভাগ্যের বাহবা দিতে হয়। বড় বেশী অশ্চর্য হয়ে বাহবা দিয়েছে সবাই। কিন্তু সবচেয়ে বেশী আশ্চর্য হওয়া এখনো বাকি আছে। এই তো সবেমাত্র বাসর-ঘরে ঢুকেছে বর আর কনে। সুলতার বৌদি অনেকেরই কানে কানে ফিসফিস করে বলেন···কাউকে কিছু বলতে কইতে হবে না। তোমরা শুধু চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখ।

—কি দেখবো বৌদি?

—জয়ন্তীর ঢলানি। পরের বরকে কাছে পেয়ে যে মেয়ে ঢলে পড়ে, নিজের বরকে নিয়ে সে আজ কি কাণ্ডটা করে একবার দেখ। বিনা টিকিটের তামাশা দু'চোখ ভরে দেখে নিয়ে তারপর যে যার বাড়ি যেও।

কথা শেষ করেই বৌদি আবার ফিসফিস করেন—ও কি, ও আবার কোন ঢঙ্। লজ্জায় মরে যাই ব্যাপার দেখছি।

হ্যাঁ, সেই জয়ন্তী সেনই বাসর-ঘরে আসরের এক কোণে মাথা হেঁট করে বসে আছে। পায়ের নখটুকুও দেখা যায় না। বেনারসীর সাজে বন্দিনী হয়ে যেন একটি নীরব ও নিথর ছবি বসে আছে। আঁচলটাও খুঁটছে না জয়ন্তী, হাত দুটোও দেখা যায় না। বোঝা যায় না, কি আছে হাতে। ব্রেসলেট না কঙ্কন? ক' গাছি চুড়ি, ক' ভরির চুড়ি।

কিন্তু আর কতক্ষণ? সবাই যে আশায় আশায় আর দাঁড়িয়ে বসে ক্লান্ত হয়ে গেল।

বৌদি বলেন—বরের সঙ্গে একটা রঙ্গের কথা কও জয়ন্তী, আমরা শুনে ধন্যি হয়ে যাই।

জয়ন্তী—আপনিই বলুন না।

বৌদি—আমি কি করে বলি জয়ন্তী? তোমার কাছে থেকে যদি সে আর্ট রপ্ত করে নিতাম, তবে হয় তো বলতে পারতাম।

নিভা, সুধা, সুলতা আর শোভা খিলখিল করে হেসে ওঠে। জয়ন্তীর অচঞ্চল চেহারাটার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বৌদি সকলের কাণের কাছে ফিসফিস করেন—চল, আর সময় নষ্ট ক'রে লাভ নেই।

ঘর ছেড়ে চলে গেল সকলেই।

ঘরের বাইরে এসে নিভা বলে—জয়ন্তী এমন গম্ভীর হয়ে গেল কেন বৌদি?

বৌদি একটু চড়া গলায় অথচ বেশ মিষ্টি করে কটকটিয়ে উত্তর দেন—গম্ভীর নয়, গম্ভীর নয়। ও-রকমই হয়। বেহায়ার মত সবই আগে আগে পরের বাসর-ঘরে ফুরিয়ে দিলে।

হাসি সামলাতে গিয়ে কথা শেষ করতে পারেন না বৌদি এবং হাসি সামলেই বলে ওঠেন—দূর ছাই, এখনও যে খাওয়া-দাওয়া বাকি আছে। অথচ রাত বোধ হয় দশটারও বেশি হয়ে গেল।

খাওয়া-দাওয়া সারতেও বেশ দেরী হলো কিন্তু, কি আশ্চর্য, বাড়ি

যাবার জন্য যার সবচেয়ে বেশি তাড়া, তিনিই আর একটু দেরী করলেন এবং নিভা, শোভা, সুধা ও সুলতাকে আরও আশ্চর্য করে দিয়ে তিনিই বাসর-ঘরের বন্ধ দরজার কাছে এসে ঘুরঘুর করতে লাগলেন। য খুঁজছিলেন, তাই পেয়ে গেলেন বৌদি। বন্ধ জানালার একটা ফাঁক।

সুলতা বলে—আঃ, কি করছো বৌদি! এমন কি আর নতুন ব্যাপার দেখবে?

বৌদি ফিসফিস করেন—ভাবতে দুঃখ হয়, পরের বাসর-ঘরে লোভীর মত সব ফুরিয়ে দিলে, নিজের বরকে কাছে পেয়েও কি দিয়ে···।

বলতে বলতে জানালার ফাঁকে চোখ রেখে চুপ ক'রে গেলেন বৌদি। পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট, বিশ মিনিট, নড়বার নাম করেন না বৌদি।

সুলতা ডাকে—আঃ, এতক্ষণ ধ'রে দেখবার আর কি আছে, চলে এস বৌদি।

কিন্তু বৌদির চোখটা যেন জানালার ফাঁকে সেঁটে গিয়েছে। শোভা দু'বার বৌদির আঁচল ধ'রে টেনেছে, তবুও বৌদির হুঁস হয় না। সুধা একবার বৌদির পিঠে চিমটি কাটে, বৌদির কঠিন শরীরটা একটুও কাঁপে না।

—ভোর ক'রে দেবে না কি বৌদি! সুলতা যখন বৌদির হাত ধরে জোর করে একটা টান দেয়, তখন যেন হুঁস ফিরে পেয়ে, কিন্তু যেন একটু হাঁপাতে হাঁপাতে জানালার কাছ থেকে সরে আসেন বৌদি।—উঃ।

নিভা বলে—কি বৌদি?

বৌদি বলেন—কী মেয়েরে বাবা! এমনটি কোথাও দেখিনি, কখনো শুনিনি।

শোভা—খুব ঢলেছে বুঝি?

বৌদি—ঢলা তো দুটিখানি কথা।

সুধা হাসে—তাহলে গলে গিয়েছে বলুন।

বৌদি—সেটাও তো দুটিখানি কথা।

সুলতা—তবে আবার কি কথা? কি করছে জয়ন্তী?

বৌদি—সে কথা আর বলা যায় না। একেবারে উপচে পড়ছে।